# ব্যাবিলন কথকতা

১৮ তম সংখ্যা
০৬ ডিসেম্বর ২০২৩

BABYLON

BABYLON

# ব্যাবিলন এগ্রিবিজনেস

## কৃষির সাথে কৃষকের পাশে

ডিসেম্বর ০৬, ২০২৩

সম্পাদক
এসএম এমদাদুল ইসলাম

সহ-সম্পাদক
রুমানা আক্তার

বিশেষ সহযোগিতা
আরিফ হোসেন
সুবন পাথাং

প্রচ্ছদ
মাহবুব শিপু

সার্বিক শিল্প নির্দেশনা
এসএম এমদাদুল ইসলাম
রুমানা আক্তার

সহযোগিতা
ব্যাবিলন পরিবার

মুদ্রণ ও অলংকরণ
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
১৫/বি মিরপুর রোড,
০১৭০৫-০৬৭০৯২

BABYLON

# সূচিপত্র


| | | | |
|---|---|---|---|
| শুভেচ্ছা বাণী | | | ৪ |
| সম্পাদকীয় | | | ৫ |
| ‘Love loves to love love . . .’ | : | এস এম আরিফ রাজ্জাক | ৯ |
| কাছের মানুষ, দূরের মানুষ | : | সাব্বির আহমেদ | ১৩ |
| যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে | : | আয়েশা সিদ্দিকা আরজু | ১৮ |
| ছিটমহলের ভ্রমণ কাহিনী | : | ওমর গাজী | ২৬ |
| সর্বনাশা যমুনা | : | মোসা. লিমা খাতুন | ৩১ |
| স্মৃতি | : | নাছিমা খানম | ৩২ |
| আলী কদম (বান্দরবান) ভ্রমণ চিরকুট! | : | মাসুদ রানা | ৩৩ |
| প্রযুক্তির বিবর্তনে আমি! | : | সুবন পাথাং | ৩৭ |
| ভ্যালীর পথে | : | মো. আব্দুল হালিম | ৪৪ |
| তৃতীয় ত্রৈমাসিক | : | ডা. মো. দিদারুল করিম | ৫৩ |
| বৃষ্টিকাব্য | : | মো. সজল মিয়া | ৫৬ |
| স্মৃতিতে রবে তুমি | : | বদিউল আলম | ৫৭ |
| এক টুকরো গল্প | : | এসএম এমদাদুল ইসলাম | ৫৮ |
| বর্ষাকাল | : | পুতুল বাড়ৈ | ৬৩ |
| অতীত ফিরে চাই | : | মো. রফিকুল ইসলাম | ৬৪ |
| কালো রংধনু | : | আরিফ হোসেন | ৬৫ |
| ভালোবাসা | : | মো. মজনু মিয়া | ৭১ |
| শৈশবের গান | : | শেখ মৃন্ময় জামান | ৭২ |
| সফরের সেরা সফর আমার হজ্ব সফর | : | মুহাম্মদ সাইফুল হক | ৭৫ |
| মা | : | মো. আমিনুল ইসলাম | ৭৯ |
| হাওড়ে হাঙ্গামা | : | আরিফ ভূঁইয়া | ৮০ |
| ফিনিক্স ভবনে সেই দিনটি | : | মো. শাহজালাল মিয়া পলাশ | ৮৬ |
| আমাদের ব্যাবিলন | : | সাদিয়া আলম | ৯০ |
| বৃহন্নলাদের গল্প | : | উম্মে সালমা ডালিয়া | ৯৪ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| দূর থেকে দেখো | : | ইথার আখতারুজ্জামান | ৯৮ |
| ভাবনা বিলাস | : | সৈয়দ মাহাবুব মোর্শেদ | ৯৯ |
| গাহি মনুষ্যত্বের গান | : | রুমানা আক্তার | ১০০ |
| ক্ষণজন্মা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী | : | ডা. সুতপা ইসলাম | ১০৭ |
| চাষা | : | মো. রিমন আলী | ১০৯ |
| "999" এর সেবা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা | : | প্রদীপ কুমার দত্ত | ১১০ |
| কোভিডের দিনগুলি | : | সোহেলী সুরাইয়া ছাদেক | ১১৫ |
| স্মৃতিতে রঙিন (১ম ও বিশেষ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত) | | | ১১৭-১৩২ |
| ফটো অ্যালবাম | | | ১৩৩-১৩৫ |

# শুভেচ্ছা বাণী

লুভা নাহিদ চৌধুরী
মহাপরিচালক
বেঙ্গল ফাউন্ডেশন

গত বছর ব্যাবিলন গ্রুপের 'কথকতা' শীর্ষক সাহিত্যবিষয়ক পত্রের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করেছি। সেখানে নতুন নতুন লেখক, কবি ও ছবি আঁকিয়েদের সঙ্গে পরিচয় হয়। কোনো বেসরকারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে সাহিত্যবিষয়ক মুখপত্র প্রকাশের উদ্যোগ কখনো গ্রহণ করা হয়েছে কি না, আমার জানা নেই। ব্যবসায়িক কাঠামোর মধ্যে সাহিত্য-প্রয়াসের ভূমিকা কী হতে পারে তাও হয়তো সকলে অনুধাবন করতে পারবেন না। তাই প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের একমুখী কার্যক্রমের মাঝে যে একখানা সাহিত্যপত্র (এক্ষেত্রে 'কথকতা') স্থান করে নিয়েছে, তা আনন্দের এবং কিছুটা বিস্ময়েরও। এই প্রয়াসের মধ্য দিয়ে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত বিশালজনগোষ্ঠীর সৃজন-প্রতিভা অন্বেষণে ব্রতী হয়ে ব্যাবিলন গ্রুপ উন্নত রুচি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে।

সাহিত্য-সৃজন, আঁকাআঁকি বা উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারার যে অক্ষয় শক্তি, তা দীপিত করে মানুষের জীবন। 'কথকতা' সাহিত্যপত্রটি অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করেছে। ভেবে ভালো লাগছে যে, প্রায় দুই যুগের এই যাত্রাপথে কত না মানুষের মন ছুঁয়ে গেছে পত্রিকাটি, কত প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে। ব্যাবিলন গ্রুপের কর্মী ও কর্মকর্তাদের লেখা, কবিতা ও আঁকা ছবি সংবলিত 'কথকতা' পত্রিকাটি খুব পুরু না হলেও হৃদয়ের প্রসারতায় ও সান্দ্র ভালোবাসায় সমৃদ্ধ। 'কথকতা'র আগামীর পথচলা সুগম হোক।

# সম্পাদকীয়

এসএম এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক
ব্যাবিলন গ্রুপ

এই কলমটা লেখা সহজ হয় যখন বিশ্বপরিস্থিতি দিয়ে তা শুরু করি।

সামগ্রিক বিশ্বপরিস্থিতি আমাদের শিল্পের টিকে থাকা ও তার বিকাশের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এর আগের গোটা দুই তিন সংখ্যায় পরিস্থিতি তুলে ধরে কোভিড-১৯, পরে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ ইত্যাদির কাঁদুনি গেয়েছি। সময়ের ব্যবধানে আজকে ওইসব পরিস্থিতির অশুভ প্রভাব থেকে বের হয়ে এসে এই শিল্প হাঁপ ছেড়ে আবার স্বাভাবিক নিয়মে চলতে শুরু করতে পেরেছে এমনটা হলে খুব ভালো হতো। কিন্তু সেটা হয়নি। কোভিড-১৯ নিয়ে এখন আর কোনও উচ্চবাচ্য হয় না বটে, কিন্তু সেই আতঙ্ক-সময়ের উপহার আমরা এখনও বয়ে বেড়াচ্ছি। ভীষণ ভাবে আক্রান্ত বৈশ্বিক অর্থনীতি ও উদ্ভূত ব্যাবসা সঙ্কোচন, গুটিয়ে আসা ব্যাবসা পরিস্থিতি এখনও চলছে। ম্যারম্যারা ভাবে হলেও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধাবস্থা এখনও চলছে। মনে হয় কেউই যেন চাইছে না এই যুদ্ধটা বন্ধ হোক। ভাবখানা – চলছে, চলুক না। সশস্ত্র বিবাদ বিবাদমান পার্টিকে সরাসরি লাভ না এনে দিলেও তা পরোক্ষ লাভের দরজাতো খুলে দিয়েছেই কোনও কোনও রাষ্ট্রের জন্য। যাদের এতে শুধু ক্ষতিই হচ্ছে তারা মাঝখানে জাতাকলে পিষ্ট হচ্ছে, আমাদের মতো দরিদ্র ও পরদেশনির্ভরশীল দেশগুলো ভুগছে। বাস্তবতা হলো – উন্নত বিশ্ব ভালো থাকলে, ধনী দেশগুলো আরও ধনী হলে আমরা ভালো থাকি।

এখন আবার মরার উপর খাড়ার ঘা পড়েছে। চীন ও তাইওয়ান নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ লাগে লাগে অবস্থা থেকে ফিরে এসেছে মনে হচ্ছে, কিন্তু এমন এক অবস্থায় মধ্যপ্রাচ্য আবার গরম হয়ে উঠেছে। ওই জায়গাটা গত বেশ কতক দশক ধরেই ওরকম গরমে তেতে আছে। বেশ ক'টা যুদ্ধ সেখানে হয়েছে, তাতেও বিশ্ব অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে, সুয়েজ খালের ভেতর দিয়ে তেলবাহী, মালবাহী জাহাজ চলাচল ব্যহত হলেই বিশ্ববাণিজ্য ও অর্থনীতি দুর্বল হয়। মনে হচ্ছে এবারের হামাস বনাম ইসরায়েল বিবাদ আগের যে কোনও সময়ের চাইতে ভয়াবহ এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এই লেখাটি যখন লিখছি (১০ নভেম্বর, ২০২৩) তখন পর্যন্ত সেখানকার পরিস্থিতি যুদ্ধ বন্ধতো দূরের কথা সাময়িক যুদ্ধ বিরতি

পর্যায়ের দিকেও এগোচ্ছে না। ইতোমধ্যে তেলের দাম আবার বাড়তে শুরু করেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ আমাদের মতো দেশকে খুব কাবু করে। ওসব দেশে গিয়ে আমাদের দেশের শ্রমিকরা সরাসরি কাজ করে– দেশে ডলার পাঠায়। এরকম যুদ্ধাবস্থা থাকলে সেখানে নতুন শ্রমিক যাওয়া থেমে যায়, ডলার আসে না। দেশ ভোগে। বর্তমান অবস্থায় দুটো ডলার কম আসাও মস্ত একটা ব্যাপার। দেশে বেশ একটা লম্বা সময় ধরে ডলার সঙ্কট চলছে। টাকার বিপরীতে ডলারের দাম ক্রমবর্ধমান। ফলে দ্রব্যমূল্যের পারদ উঠছে তো উঠছেই। দেশের সাধারণ মানুষ দ্রব্যমূল্যের এই ঊর্ধ্বগতির সাথে পাল্লা দিতে না পেরে এখন খাবার সহ বিভিন্ন খাতে জীবনযাত্রার ব্যয় সঙ্কোচন করতে শুরু করেছে। সামনে এই পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হতে পারে বলে ভাবছে সবাই।

দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ইত্যাদিকে ছাপিয়ে এখন আমাদের শিল্পে আরেকটা হারকুলিয়ান মুগুরের ঘা এসেছে। এই ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হতে যাচ্ছে শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতনভাতার ঊর্ধ্বমুখী নবায়ন। এ নিয়েও চলছে এক অরাজক অবস্থা। বিভিন্ন কারখানায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, কাজ বন্ধ করে দেওয়া, রাস্তা অবরোধ, যানবাহন ভাঙচুর সব হচ্ছে। অথচ এগুলো হবার কোনও কারণ নেই। প্রতি পাঁচ বছরে এই বেতন সংশোধন চলে আসছে অনেক বছর ধরে একটা নিয়ম মেনে কোনও ব্যতিক্রম ছাড়াই। শ্রমিক পক্ষ, মালিক পক্ষ ও সরকার পক্ষ একত্রে বসে এটা করে আসছে। এবারও তাই হয়েছে। নাটকীয় বেতন বৃদ্ধি। কিন্তু তাও কিছু কিছু শ্রমিক সংগঠন তা মানছে না, মানতে দিচ্ছে না। ফলে ঘোষণার পরেও এই নৈরাজ্য। খুবই দুঃখজনক। ক্ষতিটা কার হচ্ছে? ভেবে দেখতে পারে সংশ্লিষ্ট সবাই। গার্মেন্ট শিল্পের বর্তমান দুঃসময়ের কথাটা ভেঙেচুরে শ্রমিক-কর্মচারি-ইউনিয়ন কর্মকর্তাদেরকে বোঝাচ্ছে না কেন কেউ? এই সময়ে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার কথা ওদেরকে কেউ বলুক যাতে ডিম পাড়া রাজহাঁসটা মরে না যায়।

আমরা যারা ব্যাবিলনে আছি আমাদের সান্ত্বনা হলো আমাদের কোনও ইউনিটে কোনও শ্রমিক এই নৈরাজ্যকে সমর্থন করেনি, অবিবেচক ও ধ্বংসাত্মক নেগেটিভ শক্তির সাথে তারা হাত মেলায়নি। এটা আমাদের স্বস্তিই শুধু নয়, গর্বও। শ্রমিক ও কর্মচারিদের সাথে আমাদের পারস্পরিক আস্থার জায়গায় এটা আমাদের একটা অর্জন। শ্রমিক বেতনবৃদ্ধির এই বড়ো চাপটা এলো খুব কঠিন এক সময়ে।

টিকে থাকার সংগ্রাম শুরু হয়েছে সেই কভিডের মধ্যে। এর শেষ কোথায়?

এ বছর আমাদের কোম্পানিতে কিছু মুখবদল হয়েছে ম্যানেজমেন্ট পর্যায়ে যা উল্লেখ করার মতো। আমাদের আল

আমিন সরকার রেজা মাঝখানে বছর কয়েক অন্যত্র কাজ করে আবার ফিরে এসেছে আমাদের মধ্যে। এখন ব্যাবিলনের নিট, উভেন সকল ব্যাবসায়ের মার্কেটিং ও জেনারেল অপারেশনের সকল জোড়া চোখ তার দিকেই নিবদ্ধ আছে। আগামী দিনে ভালো কিছু দেখাবে সে ও তার টিম এমনটা তারা সহ আমরা সবাই খুব আশা করছি।

এইচ আর ডি প্রধান সুলতান সাহেবের জায়গায় এসেছেন নতুন একজন। রুবায়েত বিন আজিজ – বয়সে যুবক বলা যায়। তার যাত্রা কেবল শুরু। ওদিকে আমাদের বায়িং সার্ভিসেস কোম্পানি থেকে পুরোনো প্রধানকে চলে যেতে হলো। সেখানে এসে হাল ধরেছেন নাফিজ ইমতিয়াজ হোসেন। ওর মাথার উপর থাকছেন আমাদের গ্রুপ সিইও আরিফ ভূঁইয়া। ব্যাবিলন বায়িং সার্ভিসেস লি. কে নিয়ে এবারে আমাদের স্বপ্ন অনেক বড়ো।

ব্যাবিলন এগ্রিসায়েন্স লি. ও ব্যাবিলন এগ্রো ও ডেয়ারি লি.- এর প্রধান প্রিন্স ও তার টিম মিলে তাদের সম্মিলিত মেধার সবটুকু দিচ্ছে কোম্পানিদুটোকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে। ওদের প্রয়াস চোখে পড়ার মতো। এরকম কথা আমাদের ব্যাবিলন ট্রিমস লি. এর বেলায়ও প্রযোজ্য। আরিফ রাজ্জাক, শাকিল, মঞ্জু, মশিউর ও আরও অনেককে নিয়ে একটা দুর্দান্ত টিম সেখানে আছে।

ব্যাবিলন রিসোর্সেস লি. ও নিউজেন টেকনোলজি লি. – মিলেমিশে এরা অনেকগুলো বছর ধুঁকে ধুঁকে চলার পরে সম্প্রতি তাদের ব্যাবসায়ে সুবাতাসের একটু ছোঁয়া দিতে পেরেছে আমাদেরকে। এতে একটু উজ্জীবিত হয়ে অপেক্ষায় আছি আমরা সামনের বছর বড়ো কিছু করে এরা সেটা দেখবার জন্য। আশা করছি এদেরকে যেন আর পিছনে ফিরে তাকাতে না হয়।

ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লি. তাদের হারানো প্রডাকশন ক্যাপাসিটি পুনরুদ্ধার করেছে। বারো লাইনে নেমে গিয়েছিলো, এখন তা আবার পনেরো লাইনের ক্যাপাসিটিতে উন্নীত হয়েছে।

ব্যাবিলন গ্রুপের হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার ও তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা করে পরিচালকমণ্ডলীর সাথে কাজ করতে শুরু করেছে আমাদের লিডারশিপ টিম।

অনেকদিন থেকে চলছে আমাদের দল গঠনের প্রয়াস। অনেক ভাঙা-গড়া হয়েছে, তাও দলগঠন নিয়ে শেষ কথাটা বলতেই পারছি না। আগে এক সময় মনে হতো এদেশে কোনও সবল ও যোগ্য জনশক্তি তৈরি হয়নি রেডিমেড গার্মেন্ট সেক্টরে এসে হাল ধরবার জন্য। ফলশ্রুতিতে ভালোমন্দ যাই হোক বিদেশি তথা, ভারতীয়, শ্রীলঙ্কান, চাইনিজ, ইত্যাদির অনুপ্রবেশ। বিষয়টা আমার ভালো লাগতো না মোটেই। বিশাল জনশক্তির দেশ আমরা, এখানে যোগ্য লোকের অভাব কেন হবে? পরে এক সময় মনে হলো, না, পরিবর্তন একটা হয়েছে। জনবল তৈরি হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু ইদানিং আবার মনে হয়, আসলেই কি

তা হয়েছে? আমার এক পার্টনার বলতেন এই সেক্টরে মাথাওয়ালা মানুষের দরকার নেই, দরকার গায়ে খাটতে পারে এমন মানুষ। তার কথাটাকে আমি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মনে হয় হতাশা থেকেই তার সেই বক্তব্য। শুধু দেহসর্বস্ব নয়, শুধু মাথাসর্বস্বও নয়, মাথা ও শারীরিক সক্ষমতা দুটোই আছে, মাথা ও শরীরের যুগপত ব্যবহারে কোনও অনীহা, ক্লান্তি, অযোগ্যতা নেই এমন জনশক্তি পেলে সচেতন কোনও ব্যাবসা-পরিচালক কেন এ কথা বলবেন? মস্তিষ্কের ক্ষমতা দিয়ে এমনি এমনি কোনও কাজ হয় না, সেই ক্ষমতার বাস্তব প্রয়োগেই তা হয়। প্রয়োগ ছাড়া উর্বর মস্তিষ্কের অসাধারণ থিয়োরি কাগজে লিখে রাখা দলিল ছাড়া আর কী? – ওর কোনও ব্যবহারিক মূল্য নেই।

এবারের সংখ্যায় কিছু নতুনত্ব এনেছে সহসম্পাদক তার কুশলীদের নিয়ে। পুরোনো সংখ্যাগুলোতে প্রকাশিত লেখা থেকে বাছাই করা কিছু লেখা দিয়ে একটা ফর্মা যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে চলতিটার সাথে। এতে পুরোনো পাঠক পাঠিকারা যেমন অতীত রোমন্থন করতে পারবেন, নতুনরা তেমন পারবেন পুরোনো থেকে তুলে আনা অসাধারণ কিছু লেখার সাথে পরিচিত হতে। জনপ্রিয় হলে এই উদ্যোগটা চলবে।

গেলো বছরের মোড়ক উন্মোচনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন জনাব লুভা নাহিদ চৌধুরি। ইনি বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক। আফসোস এই অনুষ্ঠানে রক্তেমাংসে উপস্থিত থাকতে পারিনি আমি। ডেঙ্গিতে ভুগছিলাম। লুভা নাহিদ ম্যাডামের বড্ডো প্রশংসা শুনেছি অনুষ্ঠানের আগে ও পরে। এবারের সংখ্যায় তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্য রয়েছে।

প্রকাশনার কারিগরি দায়িত্বটা অন্য ঘরে চলে গিয়েছে এবার। জ্ঞানকোষ প্রকাশনী। এবারের প্রকাশনা আমাদের পাঠকদের কাছে ভালো লাগলে তার প্রশংসা যাবে তাদের দিকে, সাথে সহসম্পাদক রুমানার দিকেও।

পরিশেষে পত্রিকাতে যারা লেখা দিয়েছেন তাদের সকলকে সহ নেপথ্য কুশলীদের জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ব্যাবিলন কথকতা দীর্ঘজীবি হোক!

# ‘Love loves to love love…’

**এস এম আরিফ রাজ্জাক**
সিওও
ব্যাবিলন ট্রিমস লিমিটেড

এমন যদি হতো বিজ্ঞান ও সাহিত্যের দুই দিকপাল আইনস্টাইন ও আইরিশ লিখিয়ে জেমস জয়েস এক সাথে আড্ডা দিচ্ছেন! কী কথা হতো দুজন ‘জিনিয়াসদের জিনিয়াসের?’ এটা নিয়ে নিশ্চয় গবেষকরা উঠে পড়ে লেগে যেতেন গবেষণা করতে। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁদের কোনোদিন মুখোমুখি দেখা হয়নি, যদিও তাঁরা একই শহরে অবস্থান করেছেন। ১৯১৯ সালে আইনস্টাইন যখন জুরিখে আসেন জয়েস তখন শহরটিতে অবস্থান করছিলেন। তাঁদের দেখা না হওয়ায় ইতিহাস একটা বড়ো ঘটনাকে হারিয়েছে।

‘Love loves to love love!’ জিনিয়াস অফ দ্যা জিনিয়াসেস লিখিয়ে জেমস জয়েস এমন ভাবেই প্রেমকে শব্দের তুলিতে এঁকে দেখান তাঁর মহান উপন্যাস ইউলিসিসে। ব্যাক্তিজীবনেও তিনি প্রেমে বিশ্বাস করতেন। আমৃত্যু তিনি স্ত্রী নোরাকে ভালোবেসে গেছেন। ভীষণ ইর্ষাকাতর ছিলেন জয়েস প্রেমের ব্যাপারে। তাঁর লেখা চেম্বার মিউজিক দুর্দান্ত প্রেমের এপিফেনি। জয়েস তাঁর মহান উপন্যাস ইউলিসিসে মানব প্রেমকে দেখিয়েছেন এমন ভাবে। ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির প্রেম সামাজিক প্রেমের জাল বিস্তার করে। একজন ব্যক্তি যেন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেই শুধু ভালোবাসতে পারে অথচ চার্চত্যাগী জয়েসের ঈশ্বর সবাইকে ভালোবাসেন।

“Love loves to love love. Nurse loves the new chemist. Constable14A loves Mary Kelly. Gerty MacDowell loves the boy that has the bicycle. M. B. loves a fair gentlema. Li Chi Han lovey up kissy Cha Pu Chow. Jumbo, the elephant, loves Alice, the elephant. Old Mr Verschole with the ear trumpet loves old Mrs VErschoyle with the turnedin eye. The man in the brown macintosh loves a lady who is dead. His Majesty the King loves Her Majesty the Queen. Mrs Norman W. Tupper loves Officer Taylor. You love a certain person. And this person loves that other person because everybody loves somebody but God loves everybody.”

-Ulysses.

বিজ্ঞানের বরপুত্র আইনস্টাইন মনে করতেন মহাবিশ্বের চূড়ান্ত শক্তি হলো

প্রেম। তিনি বলেই ফেলেন 'প্রেম হলো ঈশ্বর, ঈশ্বরই প্রেম।'

প্লানেট আর্থের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই দু'সন্তানের একে অপরের সাথে আরো বেশ কিছু মিল আছে। তাঁদের দুজনেরই পড়াশোনায় হাতেখড়ি হয় ধর্মীয় স্কুলে। পরে তাঁরা দুজনই ধর্মের কড়া অনুশাসন থেকে বের হয়ে আসেন। জয়েস ও আইনস্টাইন এই দুজনেরই মিউজিকের প্রতি ছিল প্রবল আকর্ষণ। জেমস জয়েস লিখিত উপন্যাস ফেনিগ্যান্স ওয়েক এ, যে উপন্যাস তিনশত বছর পণ্ডিতদের ব্যস্ত রাখবে উপন্যাসটির মর্মার্থ উদ্ধারের জন্য, লিখিয়ে জয়েস নিজের সম্পর্কে বলেন – "Quite a musical genius in small way and the owner of an exceedingly nice ear, with tenorist voice to match!" জয়েস গায়কের পেশা বেছে নিতে চেয়েছিলেন। তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চেম্বার মিউজিক লেখেন।

আইনস্টাইন দারুণ বেহালা বাজাতেন। তিনি মিউজিকে মোৎসার্টকে গুরু মানতেন। বলা হয় তাঁর মহাবিশ্বের ব্যাখ্যায় মোৎসার্টের মিউজিকের সুর লুকিয়ে আছে।

এরা দুজনই ছিলেন দেশত্যাগী। তাঁরা তাঁদের চিন্তার স্বাধীনতার জন্য নিজ নিজ দেশত্যাগ করেছিলেন। জয়েস ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে কথা বলে, আর আইনস্টাইন নাৎসিদের বিরুদ্ধাচরণ করে।

বিশ্ববাসী এদের দুজনকেই তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের সৃষ্টিশীলতার জন্য স্বীকৃতি দেয়, ব্যতিক্রম আইনস্টাইনকে নোবেল প্রাইজ দেয়া হয়েছিল, জয়েসের ভাগ্যে যেটা জোটেনি। জয়েস এই বিপুল অংকের পুরস্কার পেলে হয়তো মহাশান্তিতে মদ্যপান করে সতেরো বছর ধরে ফেনিগ্যান্স ওয়েক লিখতে পারতেন।

১৯২১ সালে প্যারিসে এক ভাষণে জয়েস বলেন- "সাহিত্যমোদীরা যেমন ভাবে আমার নাম শুনতে অভ্যস্ত (১৯২০ সালে আমেরিকান পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট ইউলিসিসের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে জয়েস রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান) তেমন ভাবে বিজ্ঞানপ্রেমীরা ফ্রয়েড ও আইনস্টাইনের নামের সাথে পরিচিত!" তাঁদের দুজনেরই চূড়ান্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতি থাকলেও পারিবারিক জীবন ছিল দুঃসহ যন্ত্রণায় ভরা। জয়েসের কন্যা লুসিয়াকে নিয়ে তাঁর ছিল চরমতম ভোগান্তি। সতেরো বছর ধরে লেখা 'ফেনিগ্যান্স ওয়েক' শেষ হবার পরে জয়েস কন্যা লুসিয়া একিউট স্কিৎসোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়। তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠাতে হয়। আইনস্টাইনের ছোটোছেলে এডয়ার্ডও লুসিয়ার মতো স্কিৎসোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হন।

সভ্যতার ইতিহাসে সাহিত্যে জেমস জয়েস উপহার দেন শতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ইউলিসিস' আর বিজ্ঞানে আলবার্ট আইনস্টাইন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উপহার দেন- 'থিওরি অফ রিলেটিভিটি' যা অমর হয়ে আছে আজও!
জীবদ্দশায় এই জিনিয়াসদের জিনিয়াস- আইনস্টাইন তাঁর কন্যা লিজার্ল আইনস্টাইনের কাছে বিপুল সংখ্যক চিঠি লিখেছিলেন। ১৯৮০ সালে লিজার্ল বাবার লেখা ১৪০০ চিঠি হিব্রু ইউনিভার্সিটিতে দান করেন এই শর্তে যে দু'দশকের আগে চিঠিগুলো প্রকাশ করা যাবে না। ২০০০ সালে শর্তের সময় শেষ হয়ে গেলে চিঠিগুলো প্রকাশের উপর আর কোন বিধিনিষেধ থাকে না।

মেয়েকে লেখা আইনস্টাইনের একটি চিঠি, যেখানে তিনি ব্যক্ত করেন প্রেমই হলো মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ শক্তি।

"আমি চাই তোমাকে লেখা আমার চিঠিগুলো এখনি প্রকাশ করবে না। অন্তত দু'দশক যেন চিঠিগুলো অপ্রকাশিত থাকে। আমার চিঠিগুলো জনসমক্ষে আসা উচিত সেই সময় যখন মানব সমাজ জ্ঞান এবং বিজ্ঞানে আরো এগিয়ে যাবে।

হ্যাঁ, যে সত্যকে আমি বলতে চাইছি, সেটা হলো এই মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ শক্তির কথা যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখুনি দেয়া সম্ভব নয় হয়তো। আমি মনে করি এই শক্তি মহাবিশ্বের সমস্ত নিয়মকানুনকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু কেমন ভাবে করে সেটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কোন বিজ্ঞানী এখনো দিতে পারেননি। ইউনিভার্সের এই শক্তির নাম হলো 'প্রেম' (LOVE)! মহাবিশ্বের বিভিন্ন শক্তির উপর কাজ করতে যেয়ে বিজ্ঞানীরা এই প্রধানতম শক্তিকেই বাদ দিয়ে গেছেন। 'প্রেম' হলো 'আলো'। এই আলো প্রেমদাতা এবং গ্রহিতাকে আলোময় করে। প্রেম হলো চূড়ান্ত অভিকর্ষশক্তি কারণ প্রেমই দুটো ভিন্ন সত্তাকে একে অপরের প্রতি আকর্ষিত করে এবং মিলন ঘটায়। 'প্রেম' মানব সভ্যতাকে যুগ যুগ ধরে

নিশ্চিহ্ন হবার হাত থেকে রক্ষা করে আসছে। প্রেমের জন্য আমরা বেঁচে থাকি। প্রেমের জন্যই আমরা মৃত্যুবরণ করি। প্রেমই ঈশ্বর, ঈশ্বরই প্রেম। মহাবিশ্বের এই চূড়ান্ত শক্তিকে আমরা আজ অব্দি অবহেলা করে এসেছি। আমরা এই শক্তিকে অবহেলা করি এই কারণে যে মানব সমাজ এখনো জানে না প্রেমশক্তিকে কেমন ভাবে ব্যবহার করা যায়। হয়তো মানব সমাজ এখনো তৈরি নয় প্রেমের বোমা (love bomb) বানানোর জন্য, যে বোমার বিস্ফোরণে পৃথিবী থেকে মুছে যাবে লোভ, ঘৃণা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা!

প্রেমশক্তিকে দৃশ্যমান করার জন্য আমার সূত্রকে এমন ভাবে দেখো-

$E= MC^2$ ধরে নাও প্রেমশক্তি হলো প্রেম এবং আলোর গতির গণিতক স্কয়ার।
আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারি যে প্রেম হলো সর্বোচ্চ শক্তির স্বরূপ যা অসীম, সীমাহীন।

অন্যান্য সব শক্তির প্রয়োগে বিপন্ন মানব সভ্যতাকে বাঁচাতে হলে নিঃসন্দেহে এক ধণাত্মক শক্তিকে খুঁজে নিতে হবে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে সেই ধণাত্মক শক্তিই হলো- 'প্রেম'। প্রেম এবং একমাত্র প্রেমই হলো মানব সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার নিয়ামক শক্তি। প্রতিটি ব্যক্তি নিজের মাঝে বহন করে অতিক্ষুদ্র শক্তি উৎপাদক যন্ত্র, ক্ষুদ্র হলেও অসীম শক্তি সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। সেই শক্তির নাম প্রেমশক্তি!

প্রিয় লিজার্ল, মহাবিশ্বের শক্তির আদান প্রদান করার সক্ষমতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই প্রেমশক্তিকে মেনে নিতে হবে। প্রেমই পারে মহাবিশ্বকে নিরাপদ মানব বসতিতে পরিণত করতে, প্রেমই পারে ব্যক্তি মানুষের জীবনকে সুশোভিত করতে।

আমি গভীর ভাবে দুঃখিত যে আমার হৃদয়ে জমে থাকা সব কথা ঠিক মতো প্রকাশ করতে পারছি না, আর এই ব্যর্থতা আমাকে সারাজীবন কুঁড়ে খাচ্ছে। অনেক দেরি হলেও এই জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী! কিন্তু যেহেতু সময় আপেক্ষিক, মনে করছি তোমাকে এখন বলা উচিত যে ভালোবাসি তোমায় প্রিয় কন্যা, ধন্যবাদ তোমায়, আমি আমার প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছি!

তোমার বাবা

আলবার্ট আইনস্টাইন।"

*(লেখায় উল্লেখিত সকল ইংরেজি বাক্যগুলো মূল বইয়ের মতো হুবহু উপস্থাপিত হয়েছে।)*

# কাছের মানুষ, দূরের মানুষ

সাব্বির আহমেদ
গ্রুপ সিএফও
ব্যাবিলন গ্রুপ

১

মোহাম্মদপুর ব্যস্ত প্রধান সড়কের পাশেই একটা পুরাতন মডেলের দুই তলা বাড়ি। বাড়ির নাম "সেতু মঞ্জিল"। এই বাড়ির আড়াই তলায় একরুমের একটা ছোট্ট ঘরে ভাড়া থাকি। তিন বছর হয়ে যাচ্ছে এই একই বাড়িতে ভাড়া থাকছি। ভাড়া নিয়েছিলাম ছাত্র পরিচয় দিয়ে। কিন্তু গত ছয় মাস যাবৎ আমি আর ছাত্র নাই, পুরোপুরি বেকারও বলবো না কারণ দুইটা টিউশন এখনও দেই। ছয় মাস ধরে বাড়ি ভাড়া দেওয়াটা খুবই অনিয়মিত, বাড়িওয়ালা জামাল সাহেব নিভৃতচারী মানুষ, বাড়ি ভাড়া না দিলে কোনো তাগাদা পাঠান না, কবে দিবো সেটাও জানতে চান না। ভাড়া পরিশোধ অনিয়মিত হওয়ার কারণ গ্রামের বাড়ি থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাওয়া। বাড়ি ভাড়া আদায়ের দায়িত্বটা অবশ্য কেয়ারটেকার রফিকের। ওনার বয়সটা একটা মাঝামাঝি জায়গায়, না-ভাই, না-চাচা। আমি সময় সময় দুইটাই সম্বোধন করি। কথা-বার্তা খুব কম হয় তাই আগেরবার কী বলে ডেকেছিলাম ভুলে যাই।

আজ সকাল এগারোটায় আমার চাকুরির ইন্টারভিউয়ের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। সকাল নয়টায় বাসা থেকে বের হলেই পৌঁছে যেতে পারবো। মোহাম্মদপুর থেকে উত্তরা যেতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগে, আধা ঘণ্টা হাতে রেখে যেতে হবে। বাড়ি থেকে নামলেই একশ গজ দূরে বাসস্ট্যান্ড। মোহাম্মদপুর-উত্তরা রুটের বাসের শুরুর কাউন্টার আমার বাড়ির সামনে, কাজেই বাসের পছন্দমতো আসন নিয়ে উত্তরা যাত্রা করতে পারবো। বাসের দ্বিতীয় সারির বামের আসনটি আমার পছন্দের, এই আসনের সুবিধাগুলি যারা বাসে নিয়মিত যাতায়াত করে তারা ঠিকই বুঝে। একটা ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার সময় নির্বিঘ্ন ও আরামদায়ক যাত্রা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে সবচেয়ে বড়ো কাজটা রয়ে গেছে, সকালের নাস্তা তৈরি করে খেয়ে যেতে হবে। সকালের নাস্তা বললে রুটি পরাটা মনে হয়। আমি এখানে একটা সুবিধা করে নিয়েছি, সকালে নাস্তায় ভাত খেয়ে থাকি, ভাত-তরকারি যে কোনো বেলা রান্না করলে পরের দুই বেলাও খাওয়া

যায়। আমি আজ সকালে সুবিধাটা পাবো, কারণ গতকাল দুপুরে যে রান্না করেছি সেটাই সকালে নাস্তা করে বের হই।

সকাল সোয়া নয়টায় বাসা থেকে বের হলাম। নিজের হাতে ধোয়া, নিজ হাতে ইস্ত্রি করা ইন্টারভিউয়ের জন্য নির্ধারিত শার্ট প্যান্ট গায়ে দিয়েছি। বের হতেই দেখা কেয়ারটেকার চাচার সঙ্গে। ছোট্ট একটা সালাম দেখে মনে হলো মনটা খুব খারাপ। যাই হোক সালাম এর উত্তর দিলাম কিন্তু ভালো-মন্দ আর কোনো কথা হলো না।

রাস্তায় নেমেই কী মনে হলো, আমার স্মার্ট ফোনটা বের করে উবার অ্যাপ এ দেখলাম মোহাম্মদপুর থেকে উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরের ভাড়া কত আসবে। উবার মোটোতে যাওয়া ঠিক হবে না। বৃষ্টি আসলে সর্বনাশ। উবার এক্সএল ৬৫০ টাকা। সব যাচাই বাছাই করে বাসের দ্বিতীয় সারির বামের ঠিকানা খুঁজে নিলাম। বাসটি প্রায় একই জায়গায় ১০ মিনিট দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ দেখি আমার বাড়িওয়ালা জামাল সাহেব বাসে উঠছেন। বাসে উঠতে তার একটু শারীরিক কষ্টই হলো। পিছের দিকে কয়েকটি সিট এখনও খালি আছে বুঝতে পেরে শুধু ছোটো করে দৃষ্টি বিনিময় করলাম, নিজের সিট ছেড়ে দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করলাম না। প্রায় এক ঘণ্টা চুপচাপ বাসে বসে থেকে নিজের সাথে নিজেই ইন্টারভিউ এর সম্ভাব্য প্রশ্ন-উত্তর চালিয়ে গেলাম। বসে থাকতে থাকতে বিরক্তির এক পর্যায়ে যখন প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলাম পাশের যাত্রীর সঙ্গে দেশ-জাতি-উন্নয়ন নিয়ে কিছু কথা বলবো তখন সে গলাটা লম্বা করে সামনে দেখার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ তার নেমে যাওয়ার সময় হয়েছে। হঠাৎ করেই মাথায় এলো আজ বাংলাদেশ-ভারত এশিয়া কাপ ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ। দুপুর দুইটায় শুরু। আমার ইন্টারভিউটা যদি সময় মতো শুরু হয়, নিশ্চয় দুইটার মধ্যে বাড়ি ফিরে খেলাটা দেখতে পারবো। মোবাইল হ্যান্ডসেট-এ খেলা দেখবো, সেটা তো বাসে বসেই দেখা যায়। বরং বাসে বসে খেলা দেখার বা শোনার আলাদা মজা আছে। মানুষের রিঅ্যাকশন পাওয়া যায়। বাসে থাকতেই মোবাইল ডেটা রিচার্জ করে নিচ্ছি। বিকাশ অ্যাকাউন্ট-এ এগারোশ পঞ্চাশ টাকা ব্যালান্স আছে, এর থেকে একশ টাকার ডেটা কিনে নিলাম। ৬ নম্বর সেক্টর চলে আসছে, নেমে যাবো। নেমে যাওয়ার সময় মনে হলো জামাল সাহেব কি বাসে বসে আছে নাকি নেমে গেছে। আমার পিছনের মানুষটির খুব নামার তাড়া আছে, এক রকম চাপে পড়েই তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম। তাই জামাল সাহেবের খোঁজ করতে পারলাম না।

## ২

শিহাব এই মাসেও বাড়ি ভাড়াটা এখনও দেয় নাই, নিশ্চয়ই সমস্যার মধ্যে আছে। এক তলার ভাড়াটিয়া দুই মাস হলো চলে গেছে। বাড়িটা খালি

পড়ে আছে, খালিই থাক। ভালো ভাড়াটিয়া না পেলে ভাড়া দিবো না। রাত হলেই বাসাটা থেকে চ্যাঁচামেচি আর ঝগড়ার শব্দ হতো। কখনও কখনও সেটা মাত্রা ছাড়িয়ে যেতো, হয়তো সহিংস হয়ে যেতো। কিন্তু বাড়ি বেশিদিন খালি রাখাও ঠিক না। ফিটিংসগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কুক এসেছে, সে প্রতিদিনই অনেক রান্না করে, রান্নার সঙ্গে সে আরো কিছু কাজ করে দিয়ে যায়। আমি আর কেয়ারটেকার রফিক এর জন্য এত রান্না না করলেও হয়। তারপরও কী রান্না হলো এটা দেখতে ভালোই লাগে। রফিক প্রতিদিন বেঁচে যাওয়া খাবার গুলো কী করে সেটা কখনও জানতে চাই নাই।

ড্রাইভার মনে হয় আজ আসবে না। গতকাল বলছিলো ওর শরীরটা ভালো না। না আসলে অসুবিধা নেই। আমি বাসে করে উত্তরা যাবো, বাসে চড়তে আমার খারাপ লাগেনা। পাশে এসে কে বসবে আগে থেকে জানা থাকে না। পাশের যাত্রীর সঙ্গে কথা বলবো এটা এক ধরনের এক্সপ্লোর করার মতো অ্যাডভেঞ্চার। ড্রাইভার শহিদকে ফোন দেয়ার প্রয়োজন নেই, বাসায় ফেরত এসে ফোন দিবো। বাসার থেকে বের হওয়ার আগে, লাইট, ফ্যান -এর সুইচ অফ করাটা আমার অভ্যাস। এর সাথে আমি টিভির তারটা আনপ্লাগ করে যাই। অনেক বড়ো টিভি, ৪৭ ইঞ্চি এলইডি টিভি। এই ঢাউস যন্ত্রটা সেতু অনেক শখ করে কিনেছিলো। টিভির বয়স তিন বছর, আর সেতু এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে তার থেকে এক মাস কম। তার কেনা সর্বশেষ শখের জিনিস, এই জন্য যন্ত্রটার প্রতি মায়াটা একটু বেশিই।

উত্তরায় অগ্রণী ব্যাংকে আমার অ্যাকাউন্ট। এই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট-টা আমার এক প্রিয় ছাত্র করে দিয়েছিলো, ও ব্যাংকের ম্যানেজার ছিলো। ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ওর ব্যাচে মাস্টার্স–এ দ্বিতীয় হয়েছিল, চাইলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হতে পারতো। কিন্তু ব্যাংকিং পেশাটাই ও বেছে নিলো। আমার একমাত্র ছেলে সিয়াম, যুক্তরাষ্ট্রে পরিবার নিয়ে থাকে। গত আট বছরে একবার দেশে এসেছিলো, সেও তিন বছর আগের কথা। নিয়ম করে প্রতি মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে টাকা পাঠায়। টাকাগুলোর আমার

বিশেষ প্রয়োজন নাই। তারপরও টাকা পাঠাতে আমি নিষেধ করি না, কারণ নিয়মিত টাকা দেয়া-নেয়াও সম্পর্কের প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরি করে। টাকা জমা করার জন্য প্রতিমাসে ব্যাংকে আসি। আমার কিন্তু ব্যাংকে না আসলেও চলে। তারপরও নিয়ম করে টাকা আসে আর আমিও ব্যাংকে এসে জমা দেই। ব্যাংক ম্যানেজার পরিবর্তন হয় কিন্তু সবাই কেন জানি আমার ছাত্রের মতোই হয়ে যায়। এই জন্যই হয়ত ব্যাংকে বার বার আসা হয়। টাকা জমতে জমতে অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স বেশ বড়ো হয়েছে। এই টাকা দিয়ে কী করবো ঠিক জানা নাই। কিছু টাকা শহিদকে দিবো আর কিছু রফিককে। কিন্তু বেশি টাকা দিলে ওরা আর চাকরি করবে কেন, আর ওরা না আসলে আমি চলবো কী করে? শহিদের ব্যাপারটা জানি না কিন্তু রফিক এই টাকা নিয়ে যাবেই কোথায়। সে আমার সাথে আছে কেয়ারটেকার হিসেবে পাঁচ বছর হয়ে গেছে। রফিকের জীবনের গল্পটা বেশ কষ্ট দেয় আমাকে। তার ছেলেটা হতে যেয়ে স্ত্রী মারা যায়। সে ২২ বছর ধরে ছেলেটাকে একা একা বড়ো করেছে। ও নাকি খুব ভালো ক্রিকেট খেলতো। জেলা পর্যায়ে নাম-ডাক ছিলো। ছেলেটাকে ইটালি পাঠানোর জন্য ১৬ লাখ টাকা জোগাড় করলো বাড়ি-জমি সব বিক্রি করে। সেই যে এয়ারপোর্টে তুলে দিয়ে আসলো, আজ অবধি যোগাযোগ নেই। খবরে পড়ি ইউরোপ যেতে ভুমধ্যসাগর নৌকায় পাড়ি দিতে হয়, এতে অনেক দুর্ঘটনাও ঘটে। খারাপ কিছু চিন্তা করতে চাই না। রফিক গতকাল আমাকে বলছিল তার মোবাইলে ইমো ইনস্টল করে দিতে। সে জানতে পেরেছে বিদেশ থেকে ইমোতে কল আসে। আমি বলেছি তাকে আমি একটা স্মার্ট ফোন কিনে দিবো আর এই ফোনটা নিয়ে শিহাবের কাছে যেতে সে ইমো ইনস্টল করে দিতে পারবে।

আমার ব্যাংকে টাকা যে জমেই চলেছে সে টাকাগুলো দিয়ে কিছু একটা করার ইচ্ছে আছে, ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং করতে চাই, সমন্বিত কৃষি। কিন্তু এই কাজটা তো আমি একা করতে পারবো না, তরুণ উদ্যমী মানুষ প্রয়োজন। আমার উচ্চশিক্ষিত বিদেশি ছেলে তো কখনও এই উদ্যোগে আসবে না। এই সমন্বিত কৃষির চিন্তাটা কিন্তু অনেক আগেরই, আমার ব্যাংক ম্যানেজার ছাত্রকেও বলেছিলাম, সে বলল আমি আপনাকে ব্যাবসায়িক পরিকল্পনায় সহায়তা করতে পারবো। কিন্তু আমার বেশি দরকার সাথে থাকার মানুষ।

## ৩

আজকে ইন্টারভিউ বেশ ভালো হয়েছে, মোটামুটি বলেই দিলো আমাকে যশোরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে। এখন বুঝতে পারছি না যশোরে চাকুরির জন্য যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা। আমি থাকবো যশোর আর বাবা-মা থাকবে রংপুর। এই বয়সে তাদের ছেড়ে এত দূরে থাকতে হবে। যাইহোক, এই সব চিন্তা করার সময় আরো আছে। এখন দুপুরের খাবার

সেরে খেলা দেখার প্রস্তুতি নেই। বাংলাদেশ বোলিং বেশ ভালোই করলো। ভারতকে ২৪০ রানে আটকে রাখা গেছে। এখন ব্যাটিং মোটামুটি ভালো করলেই ম্যাচটা জিতে যাওয়ার ভালো সুযোগ আছে। ইতি–উতি করতে করতে দেখি বাংলাদেশের ব্যাটিং শুরু হয়ে গেছে। রফিক ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। বাড়িওয়ালার সাথে সকালে একই বাসে চড়ে গেলাম। একটু অসুস্থও মনে হলো কিন্তু কথা হলো না। এই খচখচানির থেকে ঠিক করলাম দুই তলায় নেমে নিজেই বাড়িভাড়াটা দিয়ে আসি। আর এর সাথে ভাড়া ঠিক মতো দিতে না পারার একটা দুঃখ প্রকাশ করার ব্যাপার আছে।

ঘরে ঢুকতেই দেখি এক বিরাট টিভির সামনে বসে জামাল সাহেব খেলা দেখছেন। আমাকে দেখে বসতে বললেন, আমিও ভাবলাম একটু বসে খেলাটা দেখি আর কিছুক্ষণ গল্প করি। এক সাথে বসে খেলা দেখার আনন্দটা অন্যরকম। খেলা দেখতে-দেখতে মাঝের সময় আমরা অনেক কিছু নিয়েই গল্প করলাম। আমার পড়াশোনা, চাকুরি নিয়ে, জামাল সাহেবের পরিবারের গল্প, কৃষি খামারের স্বপ্ন ইত্যাদি। মাঝে রফিক চাচা নতুন মোবাইল নিয়ে আমাদের সাথে যোগ দিল। সে নিজে খেলাটা খুব ভালো না বুঝলেও তার ছেলের খেলার গল্পটা খুব করে বললো। আমি খেলার মাঝে ফুডপান্ডা দিয়ে একটা পিৎজা অর্ডার করলাম, বিকাশে অল্প কিছু টাকা ছিলো তার প্রায় পুরোটাই শেষ করে দিলাম। কিন্তু তিনজন মিলে যে সময়টা উপভোগ করলাম সেটা অমূল্য। জামাল আঙ্কেল আমাদের বিদেশি কফি বানিয়ে খাওয়ালো। বাংলাদেশের ইতিহাস সৃষ্টি করা জয়ের মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা আমরা দারুণ উপভোগ করলাম। খেলা শেষেও অনেকক্ষণ বিশ্লেষণ চললো। রাতের খাবারটা জামাল আঙ্কেল একসাথে করার আমন্ত্রণ জানালো, প্রথমে সেটা ফেরত দিলেও পরে রান্না করে ডিনার করতে হবে ভেবে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম আর চমৎকার খাবার তিনজন একই সাথে উপভোগ করলাম। দারুণ কিছু সময়ের পরে একটা ভালো লাগার অনুভূতি নিয়ে তিনজনই যে যার মতো একই বাড়ির তিনটি ভিন্ন ঘরে চলে গেলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই জামাল সাহেব রফিক ভাইকে নিয়ে আমার ঘরে উপস্থিত, সাথে অনেক কাগজপত্র- ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং এর সমস্ত পরিকল্পনা। সারাদিন চলে গেলো পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিতে, এরই মাঝে আমার সম্ভাব্য নতুন এম্প্লয়্যার এর অফিস থেকে ফোন এসেছিল, আগামীকাল অফিস যেতে বলেছে। সাথে কিছু সময়ের জন্য আমাদের বিরতি দিতে হলো, একটা ডেভেলপার কোম্পানি এসে জামাল সাহেবকে প্রস্তাব দিয়েছে "সেতু মঞ্জিল" ভেঙে আটতলা বাড়ি করে দিবে। আগামীকাল আমাদের আবার দেখা হবে, হয়তো আরও নতুন কিছু যোগ হবে গল্প করার জন্য।

# যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে

আয়েশা সিদ্দিকা আরজু
এক্সিকিউটিভ-ওয়েলফেয়ার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

আমার জীবনে কোনো বিশেষ দিন নেই। আমার প্রতিটি দিনই সাধারণ। আমার জন্য প্রতিটি দিন একই। বারান্দায় একা একা বসে ভাবছে কুমুদ। বিয়ের আগে মনে হতো প্রতিটি দিন তমালের সাথে ওর স্বপ্নের মতো কাটবে। ঘুরবে, ফিরবে, স্বাধীনভাবে জীবনকে দুজনে মিলে উপভোগ করবে। তাই আজকের এই বিশেষ দিনটিকেও কোনদিন বিশেষ মনে হয়নি গত তিন বছরে।

অথচ...

পুরোনো স্মৃতিগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠতেই চোখ দুটো ভিজে উঠল, দুপাতা একত্র করতেই অশ্রু হয়ে নেমে এলো নোনা কষ্ট।

মা, ও মা....মেয়ের ডাকে চমকে উঠে মুখটা আড়াল করে চোখ মুছে পিছনে তাকায়। কী কোমল, কত নির্মল আর কী যে ভালোলাগা এই "মা" শব্দটায়, কুমুদের পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে তানহা। ওকে ঘিরেই আজ তার পৃথিবী, তার হাসি-কান্না, বেঁচে থাকার স্বপ্ন। কী নিষ্পাপ কোমল এই মুখটি, কী মিষ্টি হাসি। এই মুখটিই তার নিষ্ঠুর অতীতকে ভুলিয়ে রাখে। কী অদ্ভুত ভালোলাগা। ওকেই কিনা পৃথিবীর আলো দেখতে দিতে চায়নি তমাল? অঙ্কুরেই শেষ করে দিতে চেয়েছিলো? অনেক হাতে পায়ে ধরে, অনেক বোঝানোর পর রাজি হয়েছিলো তমাল। তানহাকে যখন প্রথম কোলে তুলে নিলো সেদিন তমালের চোখে পানি দেখে কুমুদ যখন কারণ জানতে চাইলো, তমাল তখন মেয়েকে একেবারে বুকের কাছে নিয়ে মেয়ের কানে কানে ফিসফিস করে বললো- তোর এই খারাপ বাবাকে কোনদিন মাফ করিসনা মা, আমি তোকে এই পৃথিবীর আলো দেখতে দিতে চেয়েছিলাম না। সরি.....।

মা তুমি এখনো রেডি হও নি? আমাদের তো অনেক লেইট হয়ে যাবে। তুমি দিনে দিনে বড্ড অলস হয়ে যাচ্ছো। কোন কথাই শুনো না। খালি কাঁদো -কোমরে দুই হাত দিয়ে এভাবেই মা কে শাসনের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলছিলো তানহা।

মেয়ের ডাকে সংবিৎ ফিরে পেয়ে মুখটাকে আড়াল করে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বললো- ওরে সর্বনাশ, কী শাসনরে বাবা, এই তুই কি আমার মা?

আমার মা-ও তো আমাকে এভাবে আমাকে শাসন করেনা রে... বুড়ি।

হুম আমি তো তোমার মা-ই, মনে নেই নানাভাই সেদিন আমাকে তোমার খেয়াল রাখতে বলেছে, তোমাকে অনেক ভালোবাসতে বলেছে আর তুমি যে ঠিকমতো ঔষধ খাওনা, এটা কি ঠিক বলো? এত দুষ্টামি কেন করো তুমি? ওহ্ আর পারিনা- একটা হাত কোমরে রেখে তর্জনী উঁচু করে ঠিক এভাবেই মাকে শাসন করে তানহা।

তাই? ওরে আমার খেয়াল রাখনেওয়ালী। নিজের খেয়াল রেখেছেন? ব্রাশ করতে হবে, নাশতা করতে হবে, ড্রেস পরতে হবে, সেগুলো কে করবে শুনি?- বসা থেকে মেয়েকে কোলে নিতে নিতে প্রশ্ন করে কুমুদ।

এ মা..... তুমি দেখছি আমার দিকে কোন খেয়ালই করোনা। আমার দিকে ভালো করে না তাকিয়েই কথা বলছো? দেখোনা আমি একদম রেডি। আজকে একটি বিশেষ দিন, তাই নানা ভাই বলেছে তাড়াতাড়ি রেডি হতে- মায়ের প্রশ্নের জবাব দেয় তানহা।

কুমুদ লক্ষ করলো সত্যিই তো, পাঁচ বছরের মেয়েটি কেমন স্বাবলম্বী হয়ে গেছে। সকাল সকাল একদম ফিটফাট। মেয়েকে বুকের কাছে নিয়ে গালে দুটো চুমো খেয়ে বললো- তুই কবে এত বড়ো হয়ে গেলিরে মা?

একহাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাসতে হাসতে তানহা মাকে বলে- মা তুমি কী যে বলো আমারতো মাত্র পাঁচ বছর হলো, এখনও তো বড়ো হতে অনেক সময় বাকি।

এক লাফে কোল থেকে নেমে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে বললো- এই দ্যাখো আমি কত বড়ো। আদি ভাইয়া আমাকে পুঁচকে বলে। হা হা। বউমণি (মামি) ও বলে।

হঠাৎ মুখটা অন্ধকার করে ফেললো তানহা, মাথাটা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো।

কুমুদ মেয়েকে কোলে নিয়ে খাটে বসিয়ে বললো- কী হয়েছে রে? হঠাৎ মুখটা ভার হয়ে গেলো কেন? কিছু হয়েছে? কেউ কিছু বলেছে? -একথা জানতে চেয়েই নিজেকে সান্ত্বনা দেয় কুমুদ- ধুর...আমি কী ভাবছি, ওকে এই বাসার সবাই কত ভালোবাসে। সবাই ওকে চোখে হারায়। সবাইতো ওর আপনজন। নানা বাড়ি মানে ওর নিজের বাড়ি।

কিছু না মা- কোমল স্বরে জবাব দেয় তানহা।

হুম, তাহলে হঠাৎ মুখ গোমড়া করলি কেন? ও, আজকের দিনে মা কোনো সারপ্রাইজ দিচ্ছিনা, তাই মন খারাপ হয়েছে? এখনো তো সময় আছে,

সারপ্রাইজতো আছেই- বললো কুমুদ।

তারপরও মেয়ের চোখগুলো ছলছল করছে দেখে আবারও প্রশ্ন করে- মাকে বলবি না? মা না তোর সব চাইতে প্রিয়, প্রিয় মানুষের কাছে কিছু লুকাতে হয়না। বলনা মা, কেন মন খারাপ।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে কুমুদকে প্রশ্ন করে তানহা- মা আমার বাবা কি খুনি? আমার বাবা কি খারাপ মানুষ?

মেয়ের মুখ থেকে কথাটা শুনে চমকে উঠে কুমুদ। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে!

যে কথাটি পাঁচটি বছর যাবৎ লুকিয়ে রেখেছে মেয়ের কাছে, আজ সেই প্রশ্নের মুখোমুখি সে। কী করবে? কী জবাব দিবে মেয়েকে? এত তাড়াতাড়িতো এই সব জানাতে চায়নি সে! ভেবেছিলো মেয়ে যখন বুঝতে শিখবে তখন সব খুলে বলবে। যেন তার বাবা সম্পর্কে সঠিক ধারণাটা সে পায়। তাহলে এখন সে কী করবে? হাত পা যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে, নিজেকে বড্ড শূন্য লাগছে।

মা জানো? বউমণির মা আছেনা? ঐ যে আদি ভাইয়ার নানু। তাকে আমার একদম পছন্দ হয়না। আমাকে দেখলেই কেমন যেন পঁচা ব্যবহার করে। বউমণি কে বলে, আদি ভাইয়া, ঝুমুমণিকে যেনো আমার সাথে মিশতে না দেয়। আমার নাকি রক্ত খারাপ। মা, রক্ত কীভাবে খারাপ হয়? -মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অনর্গল বলে যায় তানহা।

মেয়ের কথাগুলো যেনো প্রতিধ্বনি হয়ে ভেসে আসছে কানে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে কোথাও। আজ এতগুলো বছর পরে অতীত যে এভাবে ফিরে আসবে এবং তার মেয়েকে আঘাত করবে এটা তার চিন্তার বাইরে ছিলো। তার একান্ত কাছের মানুষগুলোই তার এবং তার মেয়ের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তিন বছর সম্পর্কে থাকা অবস্থায় অনার্সে পড়াকালীন সময়ে একরকম জোর করেই তমাল বিয়ে করে কুমুদকে। তমালদের অবস্থা ওদের চাইতে অনেক ভালো এবং এলাকায় খুব ভালো প্রতিপত্তি। শুরুতে বিয়েটা মন থেকে মেনে নিতে না পারলেও সময়ের সাথে সাথে নিজেকে সামলে নিয়ে সংসারী হবার চেষ্টা করে কুমুদ। তমালের বাবা মা-ও বাউণ্ডুলে ছেলের ঘরে ফেরায় কুমুদকে খুব ভালোভাবে গ্রহণ করে। ছেলের বউকে চোখে হারায় তারা। বিয়ের পর তাদের ইচ্ছেতেই মাস্টার্স শেষ করে সে। একটি বহুজাতিক সংস্থায় চাকরিও পেয়ে যায় পরবর্তীতে।

তিন ভাই বোনের মধ্যে কুমুদ মেজ। অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী পিতার সন্তান হিসেবে খুব শৃঙ্খলার মধ্যে বড়ো

হয় তারা। তাদের মা রাহেলা বেগম বেশির ভাগ সময়ই নানা রকম শারীরিক সমস্যায় ভোগে। তাই সংসারের বেশির ভাগ কাজ কুমুদকেই করতে হয়। তার ভাই দুটিও তাকে বেশ সাহায্য করে। তার বাবাও দুইবার স্ট্রোক করার কারণে সংসারের তেমন চাপ নিতে পারেন না। পেনশন আর জেলা শহরে একটি বাড়ি, এই নিয়ে কোনো রকম চলে তাদের সংসার। তিন ভাইবোন তারা পিঠাপিঠি। নিজের হাত খরচ মেটাতে নবম শ্রেণি থেকেই টুকটাক টিউশনি করতো কুমুদ। তার ভাই দুটিও তাই।

বিয়ের পর তার শ্বশুর তাকে মাসিক হাত খরচ দিতে থাকে। যেহেতু তার স্বামী তমাল কোনো কাজ করে না। পড়াশোনায় খুব ভালো হলেও বড়োলোক বাবার ছোটো সন্তান হওয়ায় অত্যন্ত আদরে বিগড়ে যাওয়া তমাল কোন কাজ কর্ম করতে চায়নি। পিতার ব্যাবসায় আর নিজের তৈরি একটি ব্যান্ড দল চালানোই তার পেশা আর নেশা। কুমুদ অনেক বোঝানোর চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হয়, তখন সে আর কিছু বলা ছেড়ে দিয়ে নিজের ক্যারিয়ার গড়ায় মনোযোগী হয়। শ্বশুর-শাশুড়ি অসম্ভব রকম ভালোবাসতো বলে তার বড়ো জা তাকে হিংসে করতো। সেও অনেক টাকাওয়ালা বাবার সন্তান। অস্ট্রিয়া থেকে পড়াশোনা করেছে। কুমুদের সাথে একদিনও ভালো ভাবে কথা বলেছে বলে মনে পড়েনা। ভাসুর প্রথম প্রথম একটু আধটু কথাবার্তা বললেও কিছুদিন পর তিনিও বদলে যেতে থাকেন। কুমুদ এই সব তেমন পাত্তা দিতো না। কারণ তার স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়িতো ঠিক আছে। কিন্তু কুমুদের এই শান্তি বেশিদিন টিকলো না। সড়ক দুর্ঘটনায় কুমুদের শ্বশুর-শাশুড়ি দুজনেই মারা যায়। একে তো তার স্বামী তমাল কোন কাজ করেনা, তাই ভাসুর আর জায়ের অপমানের মাত্রা দ্বিগুণ হয়ে গেলো। বাড়িতে খুব ভালো ভালো রান্না হলেও তার আর তমালের জন্য সেগুলো বরাদ্দ হতোনা। বিভিন্ন কারণে কুমুদকে অপমানে আর মানসিক অত্যাচারে জর্জরিত করতে থাকে তারা। তারপর একদিন তমাল কুমুদকে নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে যায়। বাবার সমস্ত সম্পত্তি ছেড়ে টুকটাক কিছু কাপড় নিয়ে এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে উঠে আপাতত। কিছুদিন পরে খুব কম টাকার মধ্যে একটি বাসা নিয়ে সংসার শুরু করে ওরা। কুমুদের একার চাকরিতে মোটামুটি চলে যায়, অল্প কিছুদিন পরেই তমালও একটা ফাইভ স্টার হোটেলে চাকরি পেয়ে যায়। এক বছরের মাথায় তাদের ঘর আলো করে আসে তানহা। যদিও তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে নতুন একটি প্রাণের আগমনের সংবাদে তমাল শুরুতে খুশি হয়নি, কিন্তু তানহাকে প্রথম কোলে নেয়ার পর থেকে সব মেনে নেয় তমাল। তখন মেয়েই যেন হয় তার পৃথিবী।

চাকরি, সংসার সামলে মেয়েকে দেয়ার মতো সময় পাচ্ছিলোনা কুমুদ। তাই তার দূর সম্পর্কের এক ফুফাতো ননদ

কে তার কাছে এনে রাখলো। তমাল বিষয়টিতে বাধা দিয়েছিলো কেননা তাদের বিয়ের আগে তার এই বোন নাকি তাকে পছন্দ করতো। তারপরও তানহার ভালোর কথা ভেবে কুমুদ ময়নাকে (তমালের ফুফাতো বোন) তার বাসায় এনে রাখে। শুরুতে সব ঠিকঠাক চলছিলো। মেয়েকে ময়নার কাছে রেখে নিশ্চিন্তে থাকতো কুমুদ। কিন্তু একদিন ময়না এসে যখন কুমুদকে জানায় সে আর এই বাসায় থাকতে চায়না, কুমুদ বেশ অবাক হয় এবং কোনো সমস্যা কি না জানতে চায়। ময়না কোনো উত্তর দেয়না। তার দুই একদিন পর তমাল ও জানায় ময়না কে যেন তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। কুমুদ কিছুই বুঝতে পারেনা। সে তার চাকরি আর মেয়ের কথা ভাবে। তাই সমস্যাটা পুরোপুরি খতিয়ে না দেখে দুজনকে বুঝিয়ে রাজি করে সে। তারপর থেকে তমাল এবং ময়নার মাঝে বেশ পরিবর্তন লক্ষ করে কুমুদ। ওরা সারাক্ষণ কী এত কথা বলে কে জানে! কুমুদ তবুও নিশ্চিত হয়, যাক আর তাহলে কোনো সমস্যা নাই!

কিছুদিন পর ময়না খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে, মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনা। টানা সাতদিন জ্বর আর বমি হতে থাকলো। কুমুদ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাইলো কিন্তু ময়না কিছুতেই যেতে রাজি হয়না। কুমুদ অবাক হয়, এদিকে তমালও তখন নিয়মিত বাসায় আসেনা। অফিসের কাজে প্রায়ই অফিসেই থাকতে হয়।

সাতদিন পর ময়না একটু সুস্থ হলো। কিন্তু তারপর থেকে ওর আচরণে বেশ পরিবর্তন লক্ষ করলো কুমুদ। ঠিক মতো কথা বলেনা, তানহার প্রতি কেমন যেন রুঢ় আচরণ করতে থাকলো, কয়েকদিন গায়েও হাত তুলতে দেখেছে। কুমুদ ভেবেছিলো হয়তো অসুস্থতার কারণে মন খিটখিটে হয়ে গেছে তাই কিছু বলতো না। এর মাঝে দু একদিন তমাল বাসায় আসলেও রাতে থাকেনি।

একদিন পাশের বাসার এক ভাবি কুমুদকে ফোন করে জানায়- ভাবি আপনার বাসায় কি কেউ নেই? অনেকক্ষণ যাবৎ আপনার মেয়েটি কাঁদছে। আমি দুইবার আপনার বাসার কলিংবেল বাজালাম কেউ কোনো সাড়া দিচ্ছে না। তাই আপনাকে কল দিলাম।

কুমুদ দেরি না করে তাড়াতাড়ি বাসায় আসলো। সে কলিংবেল বাজিয়েই যাচ্ছে কোনো সাড়া শব্দ নেই, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কী এক অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতর ধুক ধুক করতে লাগলো, হাত পা যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে, মাথা কোন কাজ করছে না। চিৎকার করে ময়নাকে ডাকতে লাগলো কুমুদ, কিন্তু কোনো সাড়া নেই। এদিকে আশেপাশের অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেলো। কুমুদ দরজার সামনেই বসে পড়লো, বারবার মেয়ের কথাই ভাবছিলো সে। তানহার বয়স যখন

পনেরো মাস, তখন থেকে প্রায়ই মেয়েটির প্রচণ্ড জ্বর আসতো, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতো। বিভিন্ন টেস্ট করার পর ডাক্তার জানায় তানহার হার্টে সমস্যা আছে। তখন থেকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওর চিকিৎসা চলছে। মাঝেমাঝেই মেয়েটির প্রচণ্ড জ্বর হয় এবং তখন সে একদম অচেতন হয়ে যায়। অবচেতন মনে মেয়ের খারাপ কিছু হয়েছে কি না ভাবতে লাগলো কুমুদ তবে আরেক আশঙ্কাও হলো, আচ্ছা ময়নার কিছু হয়নি তো? আশেপাশে মানুষজন জড়ো হয়ে গিয়েছে, এরই মাঝে কেউ একজন বলে উঠলো -আরে ভাই দরজাটা ভেঙ্গে ফেললেইতো হয়। তাই করা হলো। দরজা খোলা হলো ঠিক কিন্তু ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছে না কুমুদের। অনবরত ঘামছে সে। কয়েকজন ভেতরে ঢুকলো তার সাথে সাথে। এই ঘর সেই ঘর খুঁজতে খুঁজতে কুমুদের শোবার ঘরের সাথে লাগানো বারান্দায় গিয়ে থেমে গেলো সবাই। হাত পা ছড়িয়ে মেঝেতে দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে এলোমেলো চুলে বসে আছে ময়না। তার পাশেই ছোট্ট তানহা ঘুমিয়ে আছে, পরনে একটি প্যান্ট ছাড়া কিছু নেই। মুখের ভেতর একটি আঙ্গুল দেয়া। এই দৃশ্য আসলে দেখার মতো না, মেনে নেয়ার মতো না। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুমুদ। কে যেন বললো -কাঁদতে কাঁদতে ছোট্ট মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে, ক্ষুধায় নিজের আঙ্গুল চুষেছে, আহারে...।

ময়নাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো, ঘুমের ঔষধ খেয়ে নিজেকে শেষ করতে চেয়েছিলো সে। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পায় না কুমুদ। ময়নার গায়ে হাত তুলতে চেয়েছিলো তমালও, প্রশ্নের কোনো উত্তর দিচ্ছিলো না বলে। ময়নার বাবা নেই। ভাইদের সংসারে মায়ের জায়গা হলেও ময়নার কোনো স্থান নেই। এই সব কিছু জানতো কুমুদ, তাই ময়নাকে এইভাবে বের করে দিতে পারলো না সে। আবার এমন একটি ঘটনার পর ময়নার কাছে তানহাকে রেখে যেতেও ভরসা পাচ্ছিলো না সে। এমনিতেই একটি ব্যাপারে তার অফিসেও ঝামেলা চলছে কিছুদিন। সে ভাবলো স্যারকে বলে পরের সপ্তায় অফিস থেকে ছুটি নিবে কিছুদিনের জন্য। তারপর ময়নার ভাইয়ের সাথে কথা বলে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। এখন তো তাদের আর্থিক অবস্থা ততটা খারাপ নয়, তানহাকে দেখাশোনার জন্য নাহয় একজন লোক রেখে দেবে সে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক।

সেদিন তানহা বেশ রাত অবধি জেগে ছিলো। যেহেতু ও রাতে ময়নার কাছে থাকতো তাই ওকে ঘুম পাড়িয়ে ময়নার ঘরে রাখতে গিয়েছিলো তমাল। কুমুদ তখন নিজের ঘরে শুয়ে ছিলো। পরদিন শুক্রবার, সকালে কী কী বাজার করতে হবে সেটা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো কুমুদ। কিন্তু লাইটের আলোতে ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। চোখ

বন্ধ রেখেই পাশে হাত দিয়ে বলে- এই লাইটটা বন্ধ করোনা প্লিস।

পাশটা খালি, তার পাশে তমাল নেই। হালকা চোখ মেলে মোবাইলে সময় দেখলো রাত ১.৩০মিনিট, তমাল কোথায়? ওয়াশরুমে গিয়েছে ভেবে আবার ঘুমিয়ে পড়ে সে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলো জানে না। আবারও আলো বাধ সাধলো, আবারো ঘুম ভেঙে গেলো। তমাল রুমে নেই। উঠে বসে সে। ওয়াশরুমের দরজা বন্ধ। এমনিতেই রাত করে ঘুমানোর অভ্যাস তমালের, নিশ্চয় বারান্দায় বসে সিগারেট খাচ্ছে সে। এই ভেবে বারান্দায় উঁকি দেয় কুমুদ। কিন্তু না বারান্দায়ও নেই তমাল। ওদিকে বাইরে প্রচণ্ড ঝড় হচ্ছে। তমালকে খুঁজতে শোবার ঘর থেকে বের হতে যাচ্ছিলো কুমুদ। ঠিক তখনই পাশের ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আসলো তমাল। কী হয়েছে? এত রাতে কোথায় ছিলে তুমি? -প্রশ্ন কুমুদের। বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠে তমাল উত্তর দিলো- কিছু হয়নি, চলো ঘুমাবে। মনে অনেক প্রশ্ন নিয়ে সেদিন ঘুমাতে গেল কুমুদ।

পরদিন কুমুদের ঘুম ভাঙ্গলো অনেক দেরিতে। সকাল ৯ টা বাজে। আজ মনটা বেশ ভালো লাগছে তার। এ সপ্তাহ পুরোটাই ছুটি পেয়েছে সে অফিস থেকে। গোসল করে কলাপাতা রঙা সুতি শাড়ি পড়লো কুমুদ। সকাল সকাল ঘর গুছিয়ে সকালের জন্য হালকা নাস্তা তৈরি করলো সে, মেয়ের খাবারও তৈরি করা হয়ে গেছে। তমাল বাজার থেকে ফিরলে দুপুরের রান্নার আয়োজন শুরু করবে সে। আগামীকাল ময়নার ভাই আসবে ওকে নিতে। এক সহকর্মীর সহায়তায় মেয়ের জন্য একজন বিশ্বস্ত সাহায্যকারীও খুঁজে পেয়েছে কুমুদ। এসব ভাবতে ভাবতেই সে দেখলো তানহা ঘুম থেকে উঠে এসে তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছে। মেয়ের হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা খাওয়াতে বসলো সে, তমালও বাজার থেকে ফিরে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করছে টেবিলে। হঠাৎ কুমুদের খেয়াল হলো বেলা প্রায় এগারোটা বাজে অথচ ময়না এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। মেয়ের খাওয়া শেষ করে ময়নাকে ডাকতে গেল কুমুদ। কয়েকবার ডেকে কোনো সাড়া না পেয়ে ময়নার গায়ে হাত রাখলো কুমুদ। মনে হলো ময়নার শরীরটা অস্বাভাবিক রকমের ঠান্ডা ও শক্ত হয়ে আছে। ভয়ে দুপা পিছিয়ে গেল কুমুদ। চিৎকার করে তমালকে ডাকতে লাগলো, কুমুদের মনে পড়ল গতকাল রাতে তমালকে সে এ ঘর থেকেই বের হতে দেখেছিলো। ঠিক কী ঘটেছিলো কাল রাতে! এক অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তমালের দিকে তাকালো সে। সে যা ভাবছে সত্যিই কি তাই? কুমুদের চোখের ভাষা পড়তে পারলো তমাল। সে এগিয়ে এসে কুমুদের হাত ধরে বলল- যা হয়েছে তা একটি দুর্ঘটনা মাত্র। বিশ্বাস করো এখানে আমার কোনো দোষ নেই। ময়নার বাড়ির সবাইকে আমি ম্যানেজ করবো, এই ঘটনা পাঁচকান করবার কোনো দরকার নেই।

কুমুদ তানহাকে নিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। সে নিকটস্থ থানার নাম্বারে ফোন করে জানালো তার বাসায় খুব সম্ভবত একটি খুন হয়েছে, নিশ্চিত হতে তাদের সাহায্য প্রয়োজন। কিছুক্ষণ পরে বাসার সামনে পুলিশের গাড়ি দেখে মেয়েকে নিয়ে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে কুমুদ। তমালকে কোথাও দেখতে পেলনা সে। পুলিশকে শুরু থেকে সব ঘটনা খুলে বলে কুমুদ। ওরা ময়নার ডেডবডি নিয়ে যায় পোস্টমর্টেম করার জন্য। খবর পেয়ে কুমুদের বাবা এসে মেয়ে আর নাতনিকে নিয়ে যায়।

দুইদিন পার হয়ে গেছে, অথচ তমালের কোনো খবর নেই। সকাল বেলায় পুলিশের ফোন পেয়ে কুমুদ থানায় যায়। জানতে পারে ময়নার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এসেছে, ও চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলো, ওর মৃত্যু হয়েছে শ্বাসরোধে।

তমাল পালিয়ে যাবার কারণেই পুলিশের সব সন্দেহ গিয়ে তার উপরেই পড়ে। আজ তিন বছর পরেও তমালের কোনো হদিস পায়নি পুলিশ। তবুও অতীতকে দুঃস্বপ্ন মনে করে মাঝেমাঝেই কুমুদ আশায় বুক বাঁধে, হয়তোবা ঠিক তেমনি এক ঝড়ের রাতে ফিরে আসবে তমাল, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার শেষ চেষ্টা করতে। শুধু ফিরবে না জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সময়গুলো, যা ফেরেনা কখনোই- কারো জন্যেই। তবুও কিছু মানুষ সেই অপেক্ষাতেই থাকে, সেই আশাতেই বাঁচে।

# ছিটমহলের ভ্রমণ কাহিনী

ওমর গাজী
সহকারী কাটারম্যান, কাটিং
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

কবির একজন কাঠমিস্ত্রি। সে অন্যান্য মজুরদের মতোই দিন আনে দিন খায় ভাবে জীবন যাপন করতো। ভৌগোলিক অবস্থানে কবিরের বসবাস বাংলাদেশ ও ভারতের অমীমাংসিত ছিটমহলে। তখন ছিলো পৌষ মাস। যদিও শীতকাল কিন্তু, রোদের ঝলমলে আলোয় সারা সকাল হয়ে উঠেছিলো এক ভিন্নরকম শীতকালে।

আর এই কবিরকে নিয়ে আমাদের এই ভ্রমণ গল্প। তার সাথে কাটানো কিছু স্মৃতি, যা এখনো শরীরের রক্ত হিম করে দেয়।

তখন আমি জীবনের নতুন অধ্যায় খুলে, লেখাপড়ার ইতি টেনে শহরের পথে রওনা হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম জীবনটাকে নতুন করে সাজাবো। শহরের অলিগলি ঘুরে চাকরির জন্য বড়োই ক্লান্ত হয়ে গেলাম। অবশেষে চাকরি হলো ব্যাবিলন গ্রুপে।

আমার কর্মজীবন শুরু হয়েছিল ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার-এর কাটিং সেকশনে। শুরুতে নিজের পরিচয় দিয়ে নেই কিছুটা। আমার গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার কদমতলী গ্রামে। দরিদ্র পরিবারে চতুর্থ সন্তান হয়েও পরিবারের দায়িত্ব নিলাম কিছুটা। যাই হোক এবার গল্পে ফিরে আসা যাক।

আমি সহজে সব রকমের মানুষের সাথে মিশতে পারতাম। তাই বন্ধু-বান্ধবের অভাব হতো না। আমি যেখানে কাজ করতাম, সেখানে সবার সাথে খুব তাড়াতাড়ি ভালো সম্পর্ক হয়ে গেল। আমার যিনি সুপারভাইজার ছিলেন তার নাম জাহাঙ্গীর, তিনি সহ আমরা আরো কয়েকজন এক টেবিলে কাজ করতাম। আমার ভ্রমণের খুব পিপাসা ছিলো। তাই সবাইকে একদিন বললাম, চলেন কোথাও ভ্রমণ করে আসি। কিন্তু সবাই এক সাথে ছুটি পাবোনা বলে কেউ সাড়া দিলো না। হঠাৎ খোদাতায়ালা সহায় হলেন। টানা তিনদিন অফিস বন্ধ থাকবে। কিছুটা ভালোলাগা অনুভব হলো। বন্ধ থাকার খবর শুনে শাওন ভাই এসে বললেন ওমর, চলো ঘুরতে যাওয়া যাক। বিষয়টি নিয়ে সবাই কথা বললাম। সবাই আমাকে স্থান ঠিক করার কথা বললেন। আমার ছোটোবেলা থেকে প্রকৃতিকে খুব আপন মনে হতো। জানি না কেন! আমার আরো একটি পরিচয়

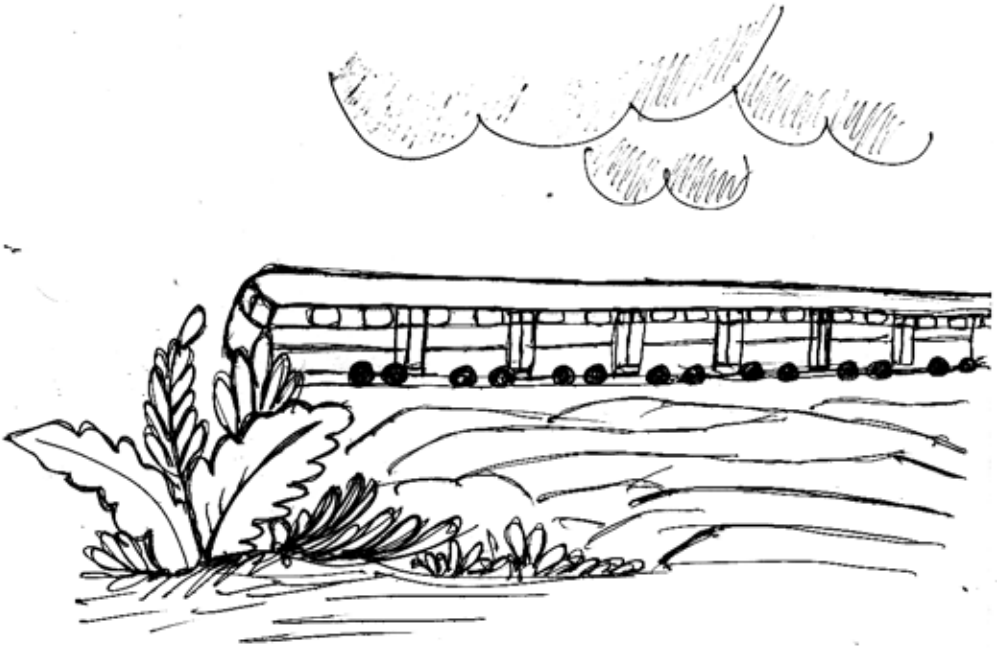

রয়েছে। আমি টুকটাক লেখালিখি করি। কবিতা, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, ইত্যাদি রচনা করি।

সেই সুবাদে সবাই আমাকে লেখক বলে ডাকে। হয়তো সেই কারণে প্রকৃতিকে এতোটা আপন মনে হয়।

যাই হোক, আমি ঠিক করলাম বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় যাবো। সবাই সাড়া দিল। আমার এক পরিচিত ভাইয়ের মাধ্যমে কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে টিকিট ক্রয় করলাম। অফিস ছুটি হলো সাতটায়। আমরা কমলাপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম সাতটা ত্রিশ মিনিটে। শহরের লাল নীল বাতি আর উঁচু উঁচু দালানগুলো দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম স্টেশনে। পরিচিত সেই ভাইয়ের কাছ থেকে টিকিট সংগ্রহ করলাম। ট্রেন ছাড়লো রাত দশটায়। ট্রেনের যাত্রা অনেক রোমাঞ্চকর হয়ে থাকে। আমাদের যাত্রাটিও তার ব্যতিক্রম ছিলো না। অনেক আড্ডা, কবিতা আবৃত্তি, গান সব মিলিয়ে দারুণ এক অনুভূতি হলো। রাত অনেক হয়ে যাওয়ায় সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। সারাদিন পরিশ্রম করে সবাই ক্লান্ত ছিলো। আমার সহযাত্রী, সৈকতের কাছে হুমায়ুন আহমেদ স্যারের হিমু নামের বইটি ছিলো। আমি বইটি পড়ছি, আর বাইরের দিকে বার বার তাকাচ্ছি। ট্রেনটি কখনো জঙ্গল, কখনো নদী, কখনো চরণভূমি, কখনো শহর, কখনো বা গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলো। সব মিলিয়ে এক দারুণ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হলো। রাতের প্রকৃতি যেন এক ভয়ংকর রকমের সুন্দর। তখন ছিলো শীতকাল। আমরা যেখানে যাচ্ছি সেটা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী এলাকার

লালমনিরহাট জেলাতে। শুনেছি সেখানের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া না থাকায়, বর্ডার এলাকায় ভালোভাবে ঘোরাফেরা করা যায়। আমাদের ট্রেন খুব ভোরে লালমনিরহাটে পৌঁছালো। অনেকদিন পর ভোরের গ্রাম দেখে অনেক আনন্দ হলো সবার। আমরা একটা অটো রিজার্ভ করে গ্রামের আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে সীমান্তের জিরো পয়েন্টের উদ্দেশে রওনা হলাম। জাহাঙ্গীর ভাই, সৈকত ও শাওন ভাই আমার উপর অনেক খুশি হলো। অনেকদিন পর গ্রামের শীতের সৌন্দর্য তাদের অনেক আনন্দ দিচ্ছে বলে জানালো। অবশেষে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছালাম। একটা ছোটো হোটেলে নাস্তা করে নিলাম। সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরি করলাম। সেখানকার বাসিন্দাদের সাথে কথা বললাম। সীমান্তে যেন এক দারুণ অনুভূতি। মাঝে মাঝে ভারতের মাটিতে গিয়ে নিজেদের ছবি তুললাম। সীমান্তের ওই পাশটা যেন অন্যরকম আনন্দ। কেমন যেন মনে হয় বিদেশের মাটিতে চলে আসলাম বিনা বাধায়। মাঝেমাঝে ভারতের সীমান্তবর্তী বিএসএফ আমাদের বের করে দেয়। আবার কখনো কখনো বাংলাদেশের বর্ডারগার্ড যেতে বারণ করে। কিছুটা ভয়, কিছুটা আনন্দ, সব মিলিয়ে ভ্রমণ যেন সার্থক বলে মনে হলো। মাঝেমাঝে মনে হয় সীমান্তে যাদের বাড়ি ঘর রয়েছে, যারা এখানকার বাসিন্দা তারা কতটা সুখী। এতো সুন্দর জায়গায় তাদের বাড়ি। প্রকৃতির এক স্বর্গরাজ্যে তাদের বসবাস। কত ভ্রমণপিপাসী এখানে ভ্রমণ করতে আসে। তাদেরকে দেখে যেন কিছুটা হিংসা হলো আমার। অবশেষে সন্ধ্যা নেমে এলো। আমরা হাঁটতে শুরু করলাম কোনো এক আবাসিক হোটেলের জন্য। আমরা লাইন ধরে আঁকাবাঁকা হয়ে হাঁটছি। ততক্ষণে গোধুলির আবছা অন্ধকার কেটে গিয়েছে। রাতের আকাশে ঝলমলে তারা আর জ্যোৎস্নার আলো যেন প্রকৃতির আরেক রূপ। আমি অবাক হলাম শীতের আকাশ এতো পরিষ্কার হয় কীভাবে। আমি উপভোগ করছি। আমার অজান্তেই মনে কবিতার ছন্দ চলে আসলো। আমি গুনগুন করে কবিতা আবৃত্তি শুরু করলাম। সবাই আমার সাথে মজা করতে শুরু করলো এ নিয়ে। হঠাৎ পাশ থেকে কেউ একজন ডেকে বললো, কে আপনারা? কোথা থেকে এসেছেন? আর কোথায় যাচ্ছেন? আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম এবং ঘুরে তাকালাম তার দিকে। লোকটির বয়স ৩৫ বা তার একটু বেশি হবে। লোকটির নাম কবির। যদিও তা পরে জানতে পেরেছি। যার কথা গল্পের প্রথমে তুলে ধরেছি। এই হলো সেই কবির সাহেব।

আমরা তাকে আমাদের পরিচয় দিলাম। তিনি আমাদের জানালেন আমরা ভারতের সীমানার অনেক ভিতরে চলে এসেছি। মনের ভিতর ধাক্কা খেলাম কিছুটা। কবির নামের ভাইটি জানালেন তিনি বাংলাদেশের বাসিন্দা। আমরা অবাক হলাম।

ভারতের ভিতরে বাংলাদেশের নাগরিক কীভাবে? তিনি জানালেন তিনি ছিটমহলের বাসিন্দা। আমার কৌতুহল হলো, তাই প্রশ্ন করলাম ছিটমহল মানে কি? তিনি জানালেন দেশ ভাগের সময় বাংলাদেশের কিছু জায়গা ভারত সীমান্তে ও ভারতের অধীনে চলে যায়, একইভাবে ভারতের কিছু জায়গা বাংলাদেশের সীমান্তের ভিতর রয়ে যায় -সাধারণত এইসব অমীমাংসিত জায়গাগুলোকে ছিটমহল বলা হয়ে থাকে। এই লালমনিরহাটে নাকি এরকম ৫২টি ছিটমহল রয়েছে। এমনই একটি ছিটমহলে কবির সাহেব তার পরিবারকে নিয়ে বসবাস করেন। তিনি আমাদেরকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ততক্ষণে আমাদের কিছুটা ভয় কেটে গিয়েছে। তিনি আমাদের মেহমানদারি করলেন। খাবার শেষ করে সবাই বাড়ির উঠানে বসে গল্প করলাম। অনেক সুন্দর এক অনুভূতি। চারদিকে ভারত, আর মাঝখানে একটুকরো ছোট্ট বাংলাদেশ। গল্প শেষ করে সবাই যার যার মতো ঘুমাতে গেলো, আমি বসে বসে শহরের বন্ধ জীবনকে স্মরণ করছিলাম। ইট আর পাথরের দেয়ালের মাঝে নিঃশ্বাস যেন যায় যায় অবস্থা। আর এখানে কত শান্তি। চারদিকে ঝিঁঝি পোকার ডাক। আকাশে জ্যোৎস্নার আলো। কবির সাহেবকে যেন ভাগ্যবান বলে মনে হলো। প্রকৃতির অরণ্যে তার বসবাস। বারবার কবির সাহেব যদি হতে পারতাম এই ভেবে কতই না আফসোস হচ্ছিলো। আমি চোখ বন্ধ করে ভাবছি। হঠাৎ বিকট শব্দে আমার চোখ খুলে গেলো। কবির সাহেব দৌড়ে চলে আসলেন আমার কাছে। বললেন, ভাই তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে আসেন। আমাকে যেন জোর করেই টেনে নিয়ে গেলেন ঘরের ভিতর। আমাদের ঘরের মেঝেতে শুয়ে পরার নির্দেশ করলেন। আমরা শুয়ে পরলাম মাটিতে। চারদিকে যেন কঠিন বজ্রপাতের মত শব্দ। মনে হলো এ যেন এক রণক্ষেত্র। কবির সাহেব জানালেন এখানকার আশপাশ দিয়ে চোরাচালান হয়। ভারত থেকে কমদামে অনেক গরু পাচার করে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। তাদের উদ্দেশ্য করে গুলি করে বিএসএফ।

আমার শরীর কাঁপছে। কেউ কেউ কান্না করে ফেললো। পরিস্থিতি এতোটাই ভয়াবহ মনে হলো যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। ভয়ে যেন প্রাণ যায় যায় অবস্থা। খোদাতায়ালার সাহায্য চাইলাম চিৎকার করে। মাঝে মাঝে মনে হলো গোলাগুলি যেন আমাদের পাশ থেকে করা হচ্ছে। এতোটাই শব্দ মনে হয় যে, একটা বুলেট এসে বুক ভেদ করে চলে গেলো। আমার হাত পা নরম হয়ে আসছিলো। মনে হলো হয়তো আর ফিরতে পারবো না প্রিয় মাতৃভূমিতে। ঘণ্টাখানিক চললো এই ভাবেই। বন্ধ হয়ে গেলো গোলাগুলি। প্রায় ঘণ্টাখানিক পরে স্বাভাবিক হলাম। ততক্ষণে আমাদের কিছুটা সাহসও ফিরে আসলো। কবির সাহেব বললেন একদিনে আপনাদের এই অবস্থা? আমাদের তো প্রতিদিনই এমন হয়।

কথাটি শুনে আমার ভাবনাগুলো যেন লজ্জা পেল। কতটা সুখী ভেবেছিলাম তাকে। কিন্তু এতো ভয়াবহভাবে রাত কাটে তাদের, তা এক রাতে বুঝে গেলাম। এতো সুন্দর প্রকৃতির মাঝে এতো ভয়ংকর রূপ যেন প্রতিদিনই জীবন যায় যায় অবস্থা। কবির সাহেব বললেন কোন এক রাতে এমন গোলাগুলির মাঝে তার বড়ো ছেলে জীবন ত্যাগ করে না ফেরার দেশে চলে যায়। কতটা অসহায় কবির সাহেব। বলার মতো কেউ নেই।

দেশের নাগরিক হয়েও কোন নাগরিক সুবিধা নেই তার। তাকে দেখার মতো কেউ নেই। একাই যেন তার পৃথিবী, তার কষ্টটা কিছুটা অনুভব করতে পারলাম। সারারাত আমাদের নির্জনে কেটে গেলো। আবার রোদের ঝলমলে আলোয় সারা সকাল আলোকিত হয়ে উঠলো। কবির সাহেব বাংলাদেশ সীমান্ত বাহিনীদের খবর দিলেন। তারা আমাদের উদ্ধার করলেন। ঢাকাগামী একটি বাসে তুলে দিলেন আমাদের। আমরা চললাম আর ভাবতে থাকলাম কবির সাহেবের কথা। তিনি আমাদের সাহায্য না করলে হয়তো ফিরে আসতে পারতাম না কখনো। এতো ভালো একজন মানুষ অথচ কতইনা কষ্টে দিন কাটে তার।

# সর্বনাশা যমুনা

মোছা. লিমা খাতুন
জেনারেল অপারেটর, ট্রেনিং সেন্টার
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

হে দুরন্ত দুর্বার সর্বনাশা যমুনা
বুঝি না তোমার ভাঙনের নমুনা।
তুমি কি একটুও বুঝো না?
নাকি তোমার ভয়াল রূপের
কোন পরিবর্তন হবে না?
যখনই আসে আষাঢ়–শ্রাবণ মাস,
তখনই তোমার মনে জাগে, আনন্দ উল্লাস।
তুমি করো ভাঙার প্রয়াস,
অনাথ-এতিমের করো সর্বনাশ।

এ গ্রাম হতে অন্য গ্রাম
ভেঙে নিয়ে যাচ্ছ অবিরাম।
মাসের পর মাস, দিনের পর দিন,
কত মানুষকে করলে তুমি সহায় সম্বলহীন।

তুমি আমার চোখের সামনে
ভেঙে নিয়ে গেলে কত মানুষের ঘর–বাড়ি,
এখনও আমি কান পেতে শুনি,
সেসব মানুষের আর্তনাদ-আহাজারী।

ওই যমুনার ধারে ছিলো দাদার কবর,
আমি মাঝে মাঝে তাহার নিতাম খবর।
কিন্তু কিছু দিন পর গিয়ে দেখি,
কবরটা যমুনার মাঝ বরাবর।

তখন আমার দুচোখ টলোমল
আমার সেই স্মৃতি বিজরিত নাটুয়াপাড়া গাঁও
তুমি যমুনার মাঝে হয়ে গেলে উধাও।
বাংলার আটষট্টি হাজার গ্রামের মাঝে
এই গ্রামকে পাইনি কোথাও খুঁজে।
এতো ছায়া, এতো মায়া, এতো স্বপ্ন,
আর কোনো গ্রামে পাইনি তো কখনো।
এই যমুনার ধারে জন্ম নিয়ে
কত মানুষ হলেন মহান,
আজকে সেই যমুনা তুমি
ঘটালে কত জীবনের অবসান।

# স্মৃতি

নাছিমা খানম
অপারেটর, সুইং
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

এইতো সেদিন স্মৃতির মেলায়
হারিয়ে যাওয়া ক্ষণগুলো,
মায়ের আদর-বাবার স্নেহের
স্মৃতি মাখা দিনগুলো।
শেষ বিকেলের দখিন মাঠে
সেই সোনালি ধানগুলো,
যাইনি ভুলে মাতাল হাওয়া
সেই পাখিদের গানগুলো।
নদীর বুকে রুপালি ঢেউ
আঁকা বাঁকা খালগুলো,
যাইনি ভুলে বর্ষা দিনের
নৌকার সারি পালগুলো।
উদাস জীবনে পার করা সেই
শেষ বিকেল আর ভোরগুলো,
সাত সকালের উঠোন জুড়ে
যাইনি ভুলে সেই রোদপোহানো দিনগুলো।

স্মৃতির পাতায় ভেসে বেড়ায় ছোট্ট নদীর কূলগুলো
কাঁদছে আজও বকুল তলায় জুঁই চামেলি ফুলগুলো।

# আলীকদম (বান্দরবান) ভ্রমণ চিরকুট!

মাসুদ রানা
ম্যানেজার, কমার্শিয়াল
ব্যাবিলন গ্রুপ

উদ্দেশ্যঃ দেশের প্রথম আয়োজিত পাহাড়ি ম্যারাথন ৪২.২০ কিলোমিটার দূরত্ব দৌড়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ।

মারায়ন তং পাহাড়টি বান্দরবানের আলীকদম থানার মিরিঞ্জারেঞ্জে অবস্থিত একটি পাহাড়। এর পূর্বপাশে রয়েছে চিম্বুকরেঞ্জ এবং মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে মাতামুহুরী নদী। পাহাড়টি মূলত ক্যাম্পিং করার সাইট হিসেবে পর্যটকদের নিকট জনপ্রিয়। মিরিঞ্জারেঞ্জের এই পাহাড়ে রয়েছে ত্রিপুরা, মারমা, মুরংসহ বেশ কয়েকটি আদিবাসীদের বাস।

কল্যাণপুর বাস স্ট্যান্ড। গাড়ি ছাড়লো ১৫ফেব্রুয়ারি ২০২৩ রাত ১০টায়। আলীকদম শেষ গন্তব্য বাসের সাথে ছুটলাম আমি। শেষগন্তব্যের বাসে উঠলে নির্ভার ও নিশ্চিন্ত লাগে। বাস থেকে নামতে পারি হেলেদুলে। আগের কোন স্টপেজে নামলে কেমন যেন একটা তাড়াহুড়া থাকে। অন্য যাত্রীরা ভুরু কুঁচকে তাকায়। সহমর্মিতার বিন্দুবিসর্গ থাকে না কারো মুখে চোখে। রাজ্যের বিরক্তি চারপাশে। মনে হয় বেঁচে থাকার গুরুত্বপূর্ণ কাজটা হয়তো সবাই বাস থেকে নেমেই করবে। তার জন্যই কোন বিশেষ কাজ একপায়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে কিংবা অচল হয়ে রয়েছে কোন সম্মিলিত উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা।

যেহেতু দেশের প্রথম কোনো হিল ম্যারাথন হচ্ছে আলীকদমে, আর এই ম্যারাথন ট্র্যাকটা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উচ্চতার যান চলাচলযোগ্য রাস্তা। তাই অনেক বাঘা বাঘা দৌড়বিদ যাচ্ছে এই দুর্গম রুটে। অনেকের সাথে বাসে দেখা হলো। কিছু গল্প, সাথে হালকা খাবার হলো একসাথে যাত্রা বিরতি হোটেলে! কারণ মোটে তিনটা ভিন্ন কোম্পানির বাস যায় আলীকদমে। তার দুইটা রাত ১০ টায় আর বাকি একটা রাত ১১টায়। আমি কল্যাণপুর থেকে বাস ছাড়ার আইডিয়া দিলাম।

আলীকদম -বান্দরবান যেতে আর্মি চেকপোস্ট আছে। তিন জায়গায় পরিচয়পর্ব সারতে হবে। চেহারা দেখিয়ে সাথে প্রমাণপত্রের দলিল। তাই NID কপি সাথে রাখতে হয়। কেউ আর্মি দেখলেই ভয়ে কাগজপত্র দিয়ে দেয়। কেউ একটু গল্প করে পার পাই। আরে ভাই এই আর্মিরা পাকিস্তানি আর্মি না যে কিছু প্রশ্ন করার আগেই আপনি

দুই হাত উপরে উঠিয়ে, লুঙ্গি তুলে কিংবা পায়জামার গিট্টু বা প্যান্টের চেন খুলার ভাব নিবেন। কিংবা ঘোমটা বা বোরখার আড়ালে যে সিঁদুর নেই ঝট করে দেখিয়ে বেশ ভালো একটা পরহেজগার অবয়বে নিজেকে কুঁকড়ে ঢেকে রাখবেন! দরকার নেই। উনারা আমাদের দেশের ভাই। নিরিবিলি পাহাড়ে আছেন প্রিয়জন ছেড়ে দূরে। একটু এটেনশন ভাবে দাঁড়িয়ে, মনোযোগ দিয়ে শুনে, শান্তভাবে কথা বলে শুভ বিদায় জানান।

সারা রাতের যাত্রা পথে বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়ে কিছু সময় দূরে-কাছে আঁধারে ঝোপ-গাছ, ক্ষেত, কত গ্রাম - বাজার ছাড়িয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে ছুটলাম সামনের দিকে। ভাবছিলাম পৌঁছাবো ঠিক কখন। ভোরের আলো সূর্য থেকে ছুটে এসে পৃথিবীর এক দিকটা, যেদিকে আমি আছি সেদিকটা ছুঁতে লাগলো। আলোকিত হচ্ছে ধীরে ধীরে চারপাশ। যখন কোন এক্সট্রিম দৌড় কিংবা সাঁতার ইভেন্ট সামনে থাকে তখন এলোমেলো অনেক ফিলোসফি রকমের ভাবনা চিন্তা আসে মাথায়। যেমন এখন ভাবলাম সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ১.৫ মিলিয়ন কিলোমিটার। সে অর্থে আলো আসতে সময় লাগে পাক্কা ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ডের মতো! প্রতি সেকেন্ডে আলো ঠিক কত কিলো পারি দিল? বেশি জটিল ভাব শুরু হচ্ছে। তাই দিলাম ছেড়ে ভাবনাটা।

চোখ খুলে জানালা দিয়ে তাকিয়ে প্রথমে বাজার, দোকান বড়ো বিলবোর্ড -এ জায়গার নাম পড়ার চেষ্টা করি। প্রথমে যে নামটা পড়লাম সেটা ছাগল খাওয়া! এটা কী চোখে দেখার

ভুল নাকি আসলেই কোন জায়গার নাম!

এরপর এলো কানা মেম্বার ঘাট, আর্মিক্যাম্প এখানে। একটা চেক পোস্ট। জায়গাগুলোর নাম দেখে ভাবলাম খুব তাড়াতাড়ি নাম পরিবর্তনের হিড়িক পরতে পারে। কারণ খুব এলেবেলে স্থানীয় হুজুগে বেখেয়ালি সব নাম এক একেকটা।

এই পর্যায়ে প্রথমে সবুজ ফুলকপি বা বাঁধাকপির বাম্পার ফলন মনে করে পরে জানলাম দেদারসে তামাক চাষ হচ্ছে। একটু অবাক হলাম। একটা এলেবেলে ভাবনা এলো অলস মস্তিষ্কে। শিহরিত হলো মন। এরা তামাক কেন চাষ করে! চাষ করলে আফিম, পপি চাষ করবে যাতে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে দ্রুত সাবলম্বী হয়ে, হাত মুখ পবিত্র পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে একটা উন্নত লেবাস গায়ে চড়াতে পারে। প্রতিটা উন্নতিতে কিছু ভ্রান্তি কিছু গরমিল থাকে। এটাও এমন এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আমরা ফলাফলে বিশ্বাসী - অর্জনের পেছনের নিষ্ঠার গল্পটা জানলেও উল্টাপাল্টা, নয়-ছয় গল্পটা আড়ালে থেকে যায় বেশিরভাগ সময়।

সকাল ৮টার আশপাশে নামলাম আলীকদম বাসস্ট্যান্ড। আবাসস্থল মারায়ন তং ইকো রিসোর্ট। এখানে বলা জরুরি, যেহেতু গ্রুপ ভিত্তিক রান করি তাই বেশিরভাগ ইভেন্টে দলবেঁধে অংশগ্রহণ করি। এই ইভেন্টে ১১ জনের একটা দল একদিন আগে আলীকদম এসে প্র্যাকটিস রান, স্থানীয় খাবার আর পাহাড়ি রাস্তার ছবি দিয়ে ফেইসবুকের পাতা গরম করে ফেলেছে। আমি একদিন পরে এসে সবার সাথে যোগ দিচ্ছি। তিনটি কক্ষে আমরা ১২জন থাকবো। কম খরচে রিজার্ভড চান্দের গাড়িতে ঘুরবো। এভাবেই সব পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছে।

সেই মতো আমি চেকইন করে সাথে সাথে সিগন্যাল পেলাম বের হবার। ভোরের খাবার আলীকদম বাজারে সেরে চান্দের গাড়িতে ডিমপাহাড় হয়ে থানচি গিয়ে দুপুরের খাবার হবে ডিসকভারি হোটেলে। প্ল্যান মতো বের হলাম আর ম্যারাথন রুট ভিসিট মানে ডিমপাহাড় যেতে যেতে রুট মার্কিং দেখলাম। পথে অর্গানাইজারদের সাথে দেখা ও গল্প, ছবি পাশাপাশি ভয়ঙ্কর রুট নিয়ে শুকনা গলায় হুল্লোড় - অভিযোগ করলাম। তারপর ডিমপাহাড়ে সেলফি সাথে গ্রুপ ছবি আর ২১ কিলোর ইউ টার্ন। জায়গাটা মনে গেঁথে নেওয়ার চেষ্টা করে গেলাম তমাতুঙ্গী পর্যটন ভিউ পয়েন্ট। এখানে আরেকদফা ছবি তুলে আশপাশ দেখে উঁকিঝুঁকি দিলাম কেওক্রাডং দেখার জন্য। কিন্তু বুঝতে পারলাম না দূরের সুউচ্চ পাহাড়ের কোনটা কেওক্রাডং বা বিজয় তাজিংডং, আলোচনা করার মুডও ছিলনা তখন। যে উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা রাস্তা দেখলাম তাতেই সবার

মুড অফ। আগামীকাল এই রাস্তায় দৌড় শেষ করার চাপা ভয়টা সবাইকে ম্রিয়মান করে দিয়েছিল। থানচি হোটেলে লাঞ্চ করে ফিরলাম চম্পট প্রাইমারি স্কুলে। এখানে ম্যারাথন বিব মানে রেজিস্ট্রেশন নম্বর যেটা দৃশ্যমান ভাবে বুকে, কোমরে পিন অথবা ফিতা দিয়ে টিশার্ট বা শর্টস এ জড়িয়ে ম্যারাথন শেষ করতে হয়। এখন বেশির ভাগ ইভেন্টে অটো ট্র্যাকিং চিপসহ বিব দেয় যাতে করে সব রানারকে ট্র্যাক করতে পারে তার দৌড়ের স্পিড, পজিশন, দূরত্ব আর টাইমিং। সাথে সাথে অনলাইনে সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আপডেট হয়ে যায়। ইভেন্ট উপলক্ষে বিশেষ টিশার্ট দেবে আয়োজক কমিটি।

এই চম্পট স্কুল হলো ইভেন্ট শেষে মেডেল প্রদান এবং সমাপনী অনুষ্ঠানস্থল। রাতে অনেকেই এই স্কুল গ্রাউন্ডে তাবু বাস করেছে। তাই দেখে মনে হচ্ছে সারিবদ্ধ সব তাবুর মেলাময় এক মাঠ। ভলেন্টিয়ারসহ হায়ড্রেশন পয়েন্ট আর সরঞ্জামগুলা এই স্কুল থেকেই সমন্বয় করা হবে। এখানে একটি মেডিকেল ফিজিও টিম থাকবে যারা ট্র্যাক ফিনিশারদের রানারদের পরিচর্যা করবেন!
হায়ড্রেশন পয়েন্ট হচ্ছে ইভেন্টভেদে নির্ধারিত দূরত্বে পানি, স্যালাইন, খেজুর, লেবু, কমলা, লবণসহ সাপোর্ট পয়েন্টস। এখান থেকে ইভেন্ট চলাকালীন রানাররা নিজেকে রিফ্রেশ করে নিতে পারে যাতে দৌড়টা ইনজুরি-ফ্রি ভাবে শেষ করতে পারে! কোনো কোনো হায়ড্রেশন পয়েন্টে প্রাথমিক ব্যাথাসহ অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থা রাখা হয়।

ইভেন্টের আগের রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যেতে হয়। কারণ ইভেন্টে রিপোর্টিং টাইম থাকে সাধারণত ভোর ৫টায়। পাশাপাশি ঘুম থেকে ওঠা, প্রকৃতির ডাক সারা এবং হালকা খাবারতো আছেই। আমি খাবার হিসাবে ওটস, সাথে তরল দুধ, খেজুর, কলা সাথে মধু মিক্সার হিসাবে খেয়ে থাকি। সবসেরে রিপোর্টিং পয়েন্টে সময়মতো উপস্থিত হওয়াটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার।

যাইহোক শেষঅব্দি ঠিকঠাক শুরু ও শেষ করেছিলাম ইভেন্ট। দৌড়ের সময় স্থানীয় লোকজন, টুরিস্ট আর আর্মিদের অবাক হয়ে তাকানোটা বেশ উপভোগ্য ছিল। যদিও এ যাত্রায় কিছু শারীরিক সমস্যা হয়েছিল আমার, তারপরও ১০২ জন ম্যারাথন ফিনিশারের মধ্যে ৩৬তম হয়েছি। ফেরার সময় মজার কিছু ঘটনাও ছিল। যাইহোক আপাতত এই পর্যন্ত।

# প্রযুক্তির বিবর্তনে আমি!

সুবন পাথাং
জুনিয়র অফিসার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

ব্যাটারির যোগ ও বিয়োগ চিহ্ন, যা পরবর্তীতে জানতে পারি ধণাত্মক ও ঋণাত্মক হিসেবে। শুধু ব্যাটারিতেই নয়, এই যোগ বিয়োগ চিহ্ন সকল প্রকার সার্কিটেই রয়েছে। এমনকি মানুষের জীবনেও এই যোগ-বিয়োগ রয়েছে, যা হয়তো চিহ্ন আকারে নয়। তবে এই ব্যাটারিই হলো একমাত্র বস্তু যা দিয়ে আমার হাতেখড়ি হয় প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কের এবং ভালো লাগার। ছোটোবেলায় আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যখন আত্মীয়-স্বজন বাসায় আসতো, তখন বেশিরভাগই উপহার হিসেবে নিয়ে আসতো ইলেকট্রনিক্স খেলনা। এই যেমন- খেলনা রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি, ভিডিও গেইমস, ব্যাটারি চালিত রোবট, হেলিকপ্টার, ইত্যাদি। এসবের সবগুলোতেই ব্যাটারি থাকতো। কিন্তু ব্যাটারি তো টেলিভিশনের রিমোটেও থাকতো, তাহলে তখন সেটা কেন দেখিনি! আমি যখন ছোটো ছিলাম তখন আমাদের বাসায় যে টেলিভিশন ছিলো তাতে কোনও রিমোট ছিলো না এবং তা ছিলো সাদা কালো ছবির। প্রতিবার সামনে গিয়ে বোতাম ঘুরিয়ে চ্যানেল পাল্টাতে ও সাউন্ড বাড়াতে হতো। যখন একটু বড়ো হই আর ব্যাটারির ব্যবহার আরও ভালোমতো বুঝতে পারি তখন ঘরে আসলো পেন্সিল ব্যাটারি চালিত রিমোটের টেলিভিশন। সে আরেক কাহিনী যা বলে শেষ করা যাবে না। যাইহোক যেটা বলছিলাম যে ব্যাটারি চালিত ইলেকট্রনিক্স খেলনা থেকে আমি যে ব্যাটারিগুলো পেতাম তার বেশিরভাগই পেন্সিল ব্যাটারি। আমার পেন্সিল ব্যাটারি দিয়ে কাজ হতো শুধু সেগুলো চার্জ ফুরিয়ে গেলে তা রিচার্জ করার চেষ্টা করা। তখন আমি এটা জানতাম না যে ব্যাটারি রিচার্জেবল এবং নন-রিচার্জেবল দু'রকমই হয়। আমি নন-রিচার্জেবল ব্যাটারিও রিচার্জ করার চেষ্টা করতাম। তখন আমি ২য় শ্রেণির ছাত্র। তেমন কিছুই বুঝতাম না। শুধু জানতাম তখনকার আমলের নোকিয়া ব্র্যান্ডের মোবাইলের একইরকম চার্জার ছিলো যেটার কেবলটা কেটে দুটো তার বের করে সেটার যোগ–বিয়োগ ব্যাটারির যোগ বিয়োগে লাগাতাম একপ্রকার স্কচ টেপ দিয়ে। আমার জীবনে প্রথম যে চার্জারটা আমি পেয়েছিলাম তা আমার এক বড়ো ভাই আমাকে দিয়েছিলো ছোটো থাকতে (বিঃদ্রঃ চার্জারটা এখনও আছে আমার কাছে)। তখনই জানতে পেরেছি লাল–কালোর খেলা।

অর্থাৎ, চার্জারের লাল তার থাকে যোগ (ধণাত্মক) আর কালো তার থাকে বিয়োগ (ঋণাত্মক)। যদিও ব্যাটারির গায়ে সর্বদাই লেখা থাকে চার্জিং সাইন দিয়ে "Do Not Attempt" আমিও বলবো যে আমার লেখা পড়ে কেউ উৎসাহিত হয়ে এটা কখনও চেষ্টা করবেন না। আমি নিজেও অনেকবার ইলেকট্রিক শক খেয়েছি। তবে সেটা ছিলো যৎসামান্য তাই কোনও বিশাল ক্ষতি হয়নি তবে হতে পারতো। এভাবে ব্যাটারি দিয়ে অনেক কাজই করেছি, মোটরে পাখা লাগিয়ে ফ্যান তৈরি করে ব্যাটারি দিয়ে ঘোরানো, চার্জার লাইটের বাল্ব থেকে দুটো তার বের করে ব্যাটারি দিয়ে বাল্বকে চার্জার লাইটে রূপান্তর, আইপিএসের ব্যাটারি সংরক্ষণ, ইত্যাদি। আমার সংগ্রহে ছিলো সবচেয়ে ছোটো এক ইঞ্চির ১২ ভোল্টের ব্যাটারি, যা দিয়ে পরবর্তীতে অনেক ১.৫ ভোল্টের বাল্ব চেক করতে গিয়ে নষ্ট করেছি। ব্যাটারির চাহিদা এখনও সকল ডিসি যন্ত্র, ডিভাইস বা যানবাহনে বিদ্যমান। সর্বশেষ আমার সংগ্রহের ব্যাটারিটি দিয়েছেন আমাদের আইটি ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ম্যানেজার, খন্দকার মশিউর রহমান স্যার। যেটা ছিলো আমার ডেস্কের ছোটো ফ্যানটার জন্য। যাইহোক, শুধু ব্যাটারি দিয়েই লেখা দীর্ঘায়িত করবো না।

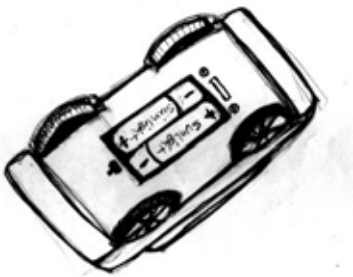

এখন অবধি যারা পড়ছেন হয়তো অনেকে ভাবতে বসে গিয়েছেন যে মানবসম্পদ বিভাগের একজন কর্মচারী হয়ে এমন ইলেকট্রনিক্স–এ উৎসাহ এলো কোথা থেকে? আমি বরাবরই ছোটোবেলা থেকেই ইলেকট্রনিক্স ও এর কাজ সম্পর্কে আমার বড়ো ভাইদের কাছ থেকে শিখেছি। আমার বাসায় একটা ডাক্তারের ব্যাগ ছিলো যা আমার বাবা আমাকে উপহার দিয়েছিলো দ্বিতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়নরত সময়ে, যা এই কিছুদিন আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমার ওই ব্যাগটিতে থাকতো যতসব গুচ্ছ তার, বিভিন্ন আকারের মোটর, কিছু বাল্ব, রিচার্জেবল ব্যাটারি, ছোটো-বড়ো চুম্বক, নষ্ট স্পিকার, রাং-রজন (তাতাল দিয়ে ব্যবহারের জন্য), ইত্যাদি সামগ্রী। ছুটি হলেই বসে পড়তাম এসব জিনিস নিয়ে। শেষবার যখন আমি ব্যাগটা চেক করেছিলাম (ডিসেম্বর ২০২২), তখনও এর সবই ছিলো এবং তা দেখে আমি নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যেমনটা অনেক বছর আগে রেখেছিলাম ঠিক তেমনই থেকে গিয়েছে।

তৃতীয়–চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত সময়ে আমি পরিচিতি লাভ করি কম্পিউটার সম্পর্কে। কম্পিউটারের তিন রকম ধরণ যেমন– সুপারকম্পিউটার, ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ। এর মধ্যে দ্বিতীয়টার সাথে অর্থাৎ ডেস্কটপের সম্পর্কে শুরুতে ধারণা হলো। একটা বড়ো বক্স আকারের টেলিভিশনের মত দেখতে মনিটর (CRT Monitor), সিপিইউ, কীবোর্ড ও বল সহ মাউস। এটা ছিলো আমার বড়ো ভাইয়ের বাসায়। তখন দেখতাম আমার দুই কাজিন (বয়সে আমার দ্বিগুণ) যারা শুধু এই কম্পিউটার দিয়ে সিনেমা দেখতো। আমি ও আমার কাছাকাছি বয়সের যে ভাই, আমরা সুযোগ পেলেই গেইমস খেলতাম। ৮০ গিগাবাইট স্টোরেজ (Harddisk Drive), ৭৬৮ মেগাবাইট র‍্যাম ও পেন্টিয়াম কোর ২ –এর ১ম জেনারেশনের সিপিইউ। এই হচ্ছে তখনকার কম্পিউটারের কনফিগারেশন। উইনডোজ এক্সপি হওয়ায় কম্পিউটার চালনাকালীন রিফ্রেশ যে কতবার দিতে হতো তার হিসেব নেই। অটো রিফ্রেশ করার জন্য একটা ছোটো আকারের ওজন মত নষ্ট ট্রান্সমিটার কিবোর্ডের এফ৫ (F5) কী–তে রেখে দুপুরের খাবার খেতে যেতাম। সে সময় সাইবার ক্যাফে নামে কিছু স্থান বেশ পরিচিতি পেয়েছিলো, যেখানে বেশিরভাগই এলাকার ছোটো ছোটো ছেলেরা গেইমস খেলতে বা দেখতে যেত আর সাইবার ক্যাফেকে যেন একটা আরকেইডে পরিণত করে ফেলতো। সেখানে কিছু লোকও আসতো যারা কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারে কিন্তু বাসায় কোনও কম্পিউটার নেই। তারা এখানে এসে ইন্টারনেট ব্যবহার করে কম্পিউটার চালাতো। আমি কোনোদিনও সাইবার ক্যাফেতে কম্পিউটার ব্যবহার করিনি বা গেইমসও খেলিনি, কিন্তু ছোটো থাকতে গিয়েছিলাম অনেকবার।

আমার এখনও মনে আছে যখন ঘরে ঘরে একটি করে মুঠোফোন ব্যবহার শুরু হয়েছিলো আর সেই সংবাদটা ঘটা করে সকলের কাছে ছড়িয়েও পড়তো, সে বিষয়টা নিয়ে তখন গল্পের আসরও শুরু হয়ে যেতো। আমাদের বাসায় যে মুঠো ফোনটা সর্বপ্রথম এসেছিলো সেটা ছিলো নোকিয়া ১১০১ মডেলের। এটা ছিলো সম্পূর্ণ সাদা কভারের। এমনকি ডিসপ্লেতে আলোও ছিলো সাদা। ছোটোবেলায় সেখানে শুধু সাপের গেইমস খেলতাম, নিয়ম করে শুধু শুক্রবারে ছুটির দিনে, তাও শুধুমাত্র আধঘণ্টার জন্য। এটা ছিলো আমার মায়ের নিয়ম। কিন্তু আমি খেলতাম এক ঘণ্টা। এর জন্য অবশ্য আমাকে বাড়তি একটা ইংরেজি প্যারাগ্রাফ মুখস্ত করতে হতো তখন। এই মুঠোফোনটা ২০১০ সালে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে টাকাভর্তি ব্যাগ সমেত হারিয়ে গেল। আমার জীবনের প্রথম মুঠোফোনটি ছিলো একটি উপহার। দিয়েছিলো আমার বাবার ছোটো ভাই। আমি যখন নবম শ্রেণিতে গ্রামে একা

থাকতাম, তখন যোগাযোগের জন্যই একটি মুঠোফোন ব্যবহার শুরু করলাম। এখানে আমি গান শুনতাম আর মুভি দেখতাম। যদিও সেটা ছিলো একটা কী-প্যাড ফোন। হাতে স্মার্ট ফোন পেয়েছিলাম কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায়। তখনই ওয়াইফাই প্রযুক্তির সাথে আমার পরিচয়। কোনও সিম বা মোবাইল ডেটা ব্যাতিত মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ডাউনলোড করা সম্ভব দেখে তখন আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম। প্রথম কোনও প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি পেলে যা হয় আরকি। এরপর থেকেই মূলত ওয়াইফাইয়ের ব্যবহার শুরু। প্রথমদিকে তিনজনে সহভাগিতা করে একটা ব্রডব্যান্ড লাইনে রাউটার দিয়ে ওয়াইফাই ব্যবহার করতাম। পরে তা পরিবর্তন করে একাই নিয়ে নিয়েছিলাম।

প্রযুক্তির সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন হলো যখন দেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু হতে লাগলো মুঠোফোনের মাধ্যমে। আমার বন্ধুরা তখন ওদের মা-বাবার মুঠোফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করতো। ব্যাক্তিগতভাবে আমি সরাসরি ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু করি আমার ব্যবহৃত প্রথম মুঠোফোনে। আমি সেখানে ২জি গতিতে ইন্টারনেট ব্যবহার করতাম যার সর্বোচ্চ গতি ছিলো ২৫৬ কিলোবাইটস। একদমই ধীরগতির ইন্টারনেট ছিলো সেটা। ছোটো একটি ডিভাইস দিয়ে সারা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় পেয়েছিলাম, সেই উদ্দীপনায় ইন্টারনেটের গতিতে কোনও ভ্রুক্ষেপ ছিলো না আমার। কোনও তথ্য খুঁজতে হলে গুগল ডটকমে (google.com) সার্চ দিয়ে লোডিং সময়টাতে বই পড়তে থাকতাম আর কিছুক্ষণ পর আবার গিয়ে মোবাইলে চোখ বুলিয়ে নিতাম। এভাবেই ইন্টারনেট ব্যবহার করা শিখতে থাকি আর পার করি আমার মাধ্যমিক। সূচনা হলো নতুন প্রযুক্তিতে পদার্পণের। মাধ্যমিক শেষে যখন ঢাকাতে ফিরে আসি তখন ৩জি গতির ইন্টারনেটের চল শুরু হয়েছে। আমার বড়ো ভাই তখন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ দিয়ে মাসিক চার্জে ইন্টারনেটের ব্যবহার করতো। জানা-অজানা অনেক তথ্যেরই সন্ধান পাওয়া যেত এই ইন্টারনেটে। শুরুর দিকে এটা এক প্রকার নেশার মতো হয়ে গিয়েছিলো যখন দেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ফেসবুকের ব্যবহার ব্যাপকহারে শুরু হলো। এক সময় মুঠোফোনে টাকা রিচার্জ করে কথা বলতে হতো। ফেসবুকের মেসেঞ্জার চালু হওয়ার পরে তাও হয়ে গিয়েছে ইন্টারনেট নির্ভর। ইন্টারনেট প্যাকেজ দিয়ে কথা বলা ও ইন্টারনেট ব্যবহার দুই-ই হতো একই খরচে। পরবর্তীতে আরও অনেক মাধ্যমের আবির্ভাব হয় যা দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করে মুঠোফোনে আরেক জনের সাথে মত বিনিময়কে করে তুলেছে আরও স্বাচ্ছন্দময়। প্রযুক্তির বিবর্তনে এই পরিবর্তন অব্যহত থাকবে আর যোগাযোগের মাধ্যম হবে উন্নত।

হয়তো একসময় এমনও হবে যে আর কোনও মাধ্যমই ব্যবহার করতে হবে না। মানুষ মনের ভাব আদান প্রদান করবে মনে মনে, এক মস্তিস্কের সাথে আরেক মস্তিস্কের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে। যাকে বলা হয় "Telepathy"। শুনতে কিছুটা এলিয়েনের প্রজন্ম মনে হলেও এটাই বাস্তব যে এমনও প্রযুক্তি চলে আসবে অতি শীঘ্রই। বিজ্ঞানের কল্যাণে প্রযুক্তির ব্যবহারে যেমন উপকার পাওয়া যায় তেমনই প্রযুক্তির অপব্যবহারে তা মানুষের জন্য অভিশাপও বয়ে আনে।

যখন আমি ৮ম শ্রেণিতে জেএসসির প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তখন আমার মা আমাকে জানালো আমি একটি ল্যাপটপ উপহার পেয়েছি। তখন আমি আবার সেই ছোটো বেলার মতো কম্পিউটারের প্রতি যে আকর্ষণ সেটা অনুভব করতে পেরেছিলাম। আমি তখনও গ্রামে ছিলাম আর আমার ল্যাপটপ ছিলো ঢাকায়। আমি চাইলেও ব্যবহার করতে পারতাম না। তখন আমি কম্পিউটারের যত প্রকার বই হাতে পেয়েছিলাম, তা পড়ে কম্পিউটারের অনেক সাধারণ জ্ঞান আয়ত্ব করছিলাম আর ল্যাপটপ ব্যবহার না করতে পারার ইচ্ছেটাকে দমন করে রাখছিলাম। অপেক্ষা শুধুই জেএসসি পরীক্ষা শেষ হবার। পরীক্ষা শেষে, আমি চলে আসলাম ঢাকায়। আর ল্যাপটপের সাথে ধীরে ধীরে নিজের পরিচিতি বাড়াতে লাগলাম। তখন আমার এক বড়ো ভাই জিজ্ঞেস করেছিলো, "তুমি কি ল্যাপটপ ব্যবহার করতে পারো?" আমার উত্তর ছিলো নীরবে শুধুই হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়া। ল্যাপটপ ব্যবহারের পাঁচ থেকে সাত বছর পর একদিন আমি নিজের ল্যাপটপ নিজেই ঠিক করছিলাম সমস্তকিছু ডিসঅ্যাসেম্বল করে, তখন সেই বড়ো ভাই আমাকে দেখে বলল, "তোমার তো কম্পিউটার সার্ভিসিং-এর একটা দোকান দেওয়া উচিত ছিলো।" এর জবাবেও নীরবে মাথা নাড়া ছাড়া আর কিছুই বলিনি। কিন্তু তিনি যখন প্রশ্ন করেছিলেন তখন আমার পিসি (পার্সোনাল কম্পিউটার) বা ব্যাক্তিগত কম্পিউটার ব্যবহারের ছিলো সূচনা মাত্র। মজার বিষয় হলো, আমার জীবনের প্রথম ব্যবহৃত ল্যাপটপ কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমও ছিলো উইনডোজ এক্সপি।

আমরা যারা অফিসে কাজ করি তারা প্রতিদিনই কাজের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করি। মেইল আদান–প্রদান, ভার্চুয়াল মিটিং, ডাটা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, এডিটিং অ্যান্ড প্রিন্টিং, ইত্যাদি এমন কাজ আমরা প্রায়শই করে থাকি। কম্পিউটার ব্যবহারের পর থেকে আমিই হয়তো একমাত্র ব্যাক্তি যে কাজে বা অকাজে কম্পিউটার ব্যবহার করি। অকাজ বলতে বোঝানো হয়েছে ক্ষীণ উৎপাদনক্ষম (Less Productive) কাজ। আমি যখন কম্পিউটার কীবোর্ড দিয়ে প্রথম টাইপ করা শুরু করেছি তখন "A quick

brown fox jumps over the lazy dog." ছাড়া আর কিছুই টাইপ করতাম না। আমাকে যিনি কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিং –এর নির্দেশনা দিয়েছিলেন তিনি এই বাক্যটুকুই আমাকে বারবার টাইপ করার জন্য বলেছিলেন। তবে আমি যে সময় টাইপিং শেখা শুরু করেছি তখন আমার প্রচুর গেইমস খেলতে ভালো লাগতো। তখন আমি আমার ল্যাপটপ কম্পিউটারে এমন একটা গেইম খেলতাম যেখানে আমাকে টাইপ করতে হতো। আর ঠিক সময়ে টাইপ না করতে পারলে "GAME OVER"। তাই তখন থেকে কম্পিউটারেও এমন একটা পাসওয়ার্ড সেট করলাম যাতে আমার প্রতিবার কম্পিউটার চালু করলেই টাইপিং চর্চা হয়। আপনি হয়তো ভাবছেন আমি আমার নির্দেশনা দানকারীর দেওয়া সেই বাক্যটিকেই পাসওয়ার্ড করে ফেলেছি! যদি আপনি এটা ভেবে থাকেন তাহলে একদম সঠিক ভেবেছেন। কারণ আমি এই পাসওয়ার্ডেই তখন স্বাচ্ছন্দবোধ করতাম। যদিও কারও কারও কাছে এটা হবে যন্ত্রণাদায়ক। কে চাইবে কম্পিউটার চালু করে এমন লম্বা পাসওয়ার্ড দিয়ে তার সময়টা নষ্ট করতে! একটু ভুল হলেই পুনরায় পাসওয়ার্ড দিতে হবে। সুতরাং একসময় আমিও যখন টাইপিং–এ একটু চালু হয়ে গেলাম তখন থেকে আর এই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করি না। যদিও এই পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের পিছনে আরেকটি গল্প লুকিয়ে আছে যা এখানে আর বিস্তারিত বলা যাবে না।

ইন্টারনেটের যুগে তখন এমনও সব গেইমস ছিলো যেখানে একজন আরেকজনের সাথে গেইমস খেলাকালীন বাক্য আদান–প্রদান করতে পারবে। তবে এখন কথাও বলা যায় গেইম খেলতে খেলতে। অনেক দেশেই আমার কিছু বন্ধু ছিলো যাদের সাথে কথা বলা হতো গেইমসের ভিতরে। এদের মধ্যে একটি মেয়ে বন্ধু ছিলো যে তখন অধ্যয়ন করত ৮ম গ্রেডে। সে থাকতো অস্ট্রেলিয়াতে আর আমি বাংলাদেশে। স্বভাবতই সময়ের একটা হেরফের তো থাকতোই। যার ফলে যোগাযোগ কমে যেতে যেতে এখন আর কথা হয় না। শেষবার (জানুয়ারী ২০২৩) সে যখন মেসেজ দিয়েছিলো ফেসবুক মেসেঞ্জার–এ তখন আমার ইয়ামাহার কীবোর্ড পিয়ানোর মিউজিক তাকে শুনিয়েছিলাম। সে শুনে বেশ খুশি হয়েছিলো। অনেকদিন পর তার সাথে যোগাযোগ, প্রোফাইল পিকচারে দেখলাম সেও অনেক বড়ো হয়ে গিয়েছে, অনেকটা সুন্দরী হয়েই বেড়ে উঠেছে সে। যাক, প্রযুক্তির বিষয়ে লেখা আর ভলোলাগাতে টেনে নিয়ে যেতে চাই না। আমার টাইপিং –এর অগ্রগতি এভাবেই হয়েছিলো। তবে এটা ধারণা করিনি যে টাইপিং করে দেশি বিদেশি অনেক বন্ধু পাওয়া যাবে।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আমার এক বন্ধুর ল্যাপটপ–এ সমস্যা

দেখা দিলো। সে তার ল্যাপটপ নিয়ে আসতো বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি বেশিরভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি অথবা কম্পিউটার ল্যাবে সময় কাটাতাম। ক্লাসে অনেকে এটা নিয়ে আমাকে ঠাট্টা করে বলতো, "ওকে কোথাও না পেলেও কম্পিউটার ল্যাবে ঠিকই পাওয়া যাবে।" যাক আমি বলছিলাম আমার এক বন্ধুর কম্পিউটারের সমস্যা নিয়ে। ওর সাধারণ সমস্যাগুলো নাহয় ঠিক করে দেওয়া গেলো, কিন্তু এবারের সমস্যাটি ছিলো কিছুটা আলাদা। ও বলল ওর কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড আর কাজ করছে না। আসলে পাসওয়ার্ডটি সে ভুলে গিয়েছে। এখন উইন্ডোজ আবার পুনরায় না দিয়ে কীভাবে সব ডাটা সংরক্ষণ করা যায় সে ফন্দিই আঁটছিলাম। আমি আবার ছোটোবেলা থেকেই কম্পিউটারের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করতাম। তাই আমার কাছে এই সমস্যাটাও মনে হলো কোনও সমস্যাই না। আমি ঠিকই সিস্টেম সফটওয়্যার থেকে কমান্ড ব্যবহার করে কিছু কোড ইনপুট দিয়ে পাসওয়ার্ড রিসেট করে দিলাম। যদিও আমার বন্ধুর প্রতিক্রিয়া ছিলো একদমই সাধারণ। মানে সে ধরেই নিয়েছিলো যে এটা আমি পারবোই। তাই ওর ল্যাপটপ কম্পিউটার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ে, কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে বাসায় চলে আসলাম।

এখন সময় নতুন কিছু পাওয়ার অপেক্ষায়। নতুন কিছুর আবির্ভাবে মানুষের মঙ্গল হয় নাকি অমঙ্গল, তাই দেখার। সেদিন খবরের পাতায় পড়লাম, উত্তর আমেরিকা ও মেক্সিকোর সীমানায় প্রহরী বা রক্ষী হিসেবে রাখা হয়েছে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) সমৃদ্ধ কুকুর রোবট। শুনেছি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স সমৃদ্ধ রোবটের ব্যাপক ব্যবহার করা হলে এরা মানুষকেও ছাড়িয়ে যাবে। অনেকটা "Detroit: Become Human" গেইমসের মতো। ভবিষ্যৎ সর্বদাই অনিশ্চিত। তাই প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়েও অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। একবার ভেবে দেখুন যদি মানুষের মনের ভাব অন্য কোনও প্রাণী বা রোবট জেনে যায় কোনও প্রকার শব্দ বা বাক্যের বিনিময় ছাড়া, কেমন হবে!

# ভ্যালীর পথে

মো. আব্দুল হালিম
সিনিয়র অফিসার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

## ১

যেদিন প্রথম পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়ালাম সেদিন খুব ভয় হয়েছিলো। এতো বড়ো পাহাড়, আমি যদি কোনো ভাবে পড়ে যাই তাহলে আমার খোঁজ মিলবে তো? কীভাবেই বা এতো বড়ো পাহাড় পাড়ি দিবো? এতো খাড়া স্লোপ জীবনে কখনো দেখিনি। যদি পা পিছলে পড়ে যাই বা পা অসাড় হয়ে যায় তখন? কত শত প্রশ্ন। প্রশ্নের বিপরীতে কোনো উত্তর নেই। উত্তর ছাড়া দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এক সময় উপলব্ধি করলাম পাহাড়ের কাছে প্রশ্ন চলে না। পাহাড়ের কাছে চেয়ে নিতে হয়। প্রশ্ন করা যায় সমুদ্রকে। সমুদ্রকে প্রশ্ন করলে পাল্টা ঢেউ দিয়ে আওয়াজ করে, উত্তর দেয়। কিন্তু পাহাড় এমন না। বিশালাকার দানব শুধু শুনেই যায়। কখনো কোনো উত্তর করে না। আর আমি এখন যে পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এই পাহাড় এতোই বিশাল যে মেঘ কে ছুঁয়ে ফেলেছে। একেবারে মেঘ ফুটো করে সোজা উচ্চতায় উঠে গেছে। এই পাহাড় জয় করতে প্রয়োজন হয় শুধু সাহসের। এমন পাহাড়ের সাথে জোর খাটে না। এমন পাহাড় আপস ও করে না। এমন পাহাড়ের সাথে প্রয়োজন অদম্য সাহস আর প্রচুর পরিশ্রম। তবেই পাহাড়ে উঠা যায়।

এ পর্যায়ে পাঠকদের সুবিধার্থে আমি কোথায় আছি একটু পরিচিতি না দিলেই নয়। আমি আছি জুকো ভ্যালিতে। জুকো ভ্যালি ভারতের নাগাল্যান্ড প্রদেশের একটি পাহাড়ি ভ্যালি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২,৪৫২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত একটি পাহাড়ি উপত্যকা। এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগাল্যান্ডের কোহিমা জেলায় অবস্থিত। এখানে সূর্যের সাথে মেঘ খেলা করে। পাহাড়ি উপত্যকায় শহুরে জনতার অজান্তেই ছোটো ছোটো ডোর্ফ বা বামন বাঁশ গাছের ভিড়ে লাল, নীল, হলুদ লিলি আর পাহাড়ি ফুল ফুটে থাকে। দেখলে বোধ হয়, কে যেনো প্রকৃতিতে সবুজের মধ্যে বিভিন্ন রঙের ফুলের গালিচা বিছিয়ে রেখেছে কোন বিশেষ অতিথির আমন্ত্রণে। অতিথি আসলো বলেই। আর এই সবুজ গালিচার নিচে দিয়েই বয়ে গেছে ঠান্ডা খরস্রোতা পাহাড়ি ছড়া। আর উপত্যকা দিয়ে বয়ে যাওয়া হিম হাওয়া আর মেঘ ভিন্ন এক দৃশ্য তৈরি করে। এ যেনো পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা এক আদিমতা।

আমার একমাত্র ট্যুরমেট আনোয়ারের সাথে প্রথম পরিচয় হলো ৩০ শে জুন, ট্যুর দেয়ার ঠিক দুইদিন আগে। ভদ্রলোক নিজেও জুকো ভ্যালি ঘুরতে যেতে চাচ্ছিলেন আমার মতো। তবে কাউকে পাচ্ছিলেন না। শেষমেশ ফেসবুকে আমাকে পেয়ে গেলেন। আর আমাকে বলা মাত্রই রাজি হয়ে গেলাম।

২ তারিখ রবিবার খুব ভোরে তামাবিল বর্ডারে ট্যুরমেট আনোয়ার ভাইয়ের সাথে দেখা করলাম। দৈহিক গড়নে লম্বা, শ্যামলা, আর একটু চুপচাপ ধরণের লোক। তার পিঠে ৫০ লিটারের একটি ট্রাভেল ব্যাগ। ব্যাগের উপর কটকটে সবুজ রঙের ব্যাক কভার যা খুব সহজেই দূর থেকে চোখে পরে যায়। তার সাথে হালকা কথাবার্তা বলে বর্ডারের কাজ শেষ করে ফেললাম এবং ১০ টা নাগাদ বর্ডার পার হয়ে ডাউকি শহরে পৌঁছে গেলাম। শুরু হলো আমাদের পাহাড়ি রাস্তার যাত্রা। ডাউকি থেকে শিলং আর সেখান থেকে সোজা গোয়াহাটি ট্রেন স্টেশন।

ট্রেন স্টেশনে গিয়েই জানতে পারলাম ডিমাপুর যাওয়ার সব ট্রেনের টিকেট বুকড। কোনোভাবেই ট্রেন টিকেট পাওয়া গেলো না কাউন্টার থেকে। এই পর্যায়ে অচেনা অজানা শহরে আমরা নতুন পরিচিত হওয়া দুইজন নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এক রকম বিপদেই পরে গেলাম। হতাশ হয়ে টিকেট কাউন্টার থেকে ফেরত আসছিলাম। মনে মনে ভাবছি দেখি বাস ম্যানেজ করা যায় কিনা। তবে এও জানি যে বাসগুলো ডিমাপুর যায় সেই বাসগুলো এতক্ষণে রওনা দিয়ে দিয়েছে সুতরাং সে ভাবনাও বাদ। যাইহোক, পেছন থেকে একজনের ডাক শুনলাম।

হালকা গড়নে শ্যামলা মধ্যবয়সী এক লোক, গায়ে ময়লা কাপড়। হয়তো স্টেশন ঘিরেই তার জীবন ও জীবিকা। মানুষের জীবন তার জীবিকা কে ঘিরে আবর্তিত হয়। একসময় জীবিকা জীবন কে নিজের অংশ করে নেয়। স্বভাবে, ধ্যানে আর চিন্তায় সব দিক দিয়ে চাদরের মত ঢেকে ফেলে। উনি ও তাই, অপরিষ্কার, ধুলোয় জমা লাল রঙের রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের সাথে মিশে গেছেন। তিনি ট্রেনের টিকেট ম্যানেজ করে দিতে পারবেন বলে জানালেন তবে এর জন্য তাকে টিকেটের দামের সাথে কিছু অতিরিক্ত রুপি দিতে হবে। আমরা নির্দ্বিধায় মেনে নিলাম। কারণ যে করেই হোক রাতের ট্রেনেই পৌঁছাতে হবে। নয়তো পরের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

## ২

আজ সোমবার, ৩ জুলাই ২০২৩ সাল। আমরা শেষ রাতে ডিমাপুর এসে পৌঁছেছি। এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ থেকে একটু কম। গায়ে ঠান্ডা ঠান্ডা অনুভূতি হচ্ছে তবে একেবারে সোয়েটার–শাল গায়ে দিয়ে হাঁটার মত না। খুব বেশি ঘোরাফেরা না করে ট্যাক্সিতে উঠে পড়লাম। পাহাড়ি সাপের মত প্যাঁচানো রাস্তা পার

করে যখন কোহিমায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন কোহিমা প্রায় ঘুমন্ত। সামান্য খাবার খেয়ে সেখান থেকে রওনা করলাম কোহিমার ছোটো একটা গ্রাম কিগুয়েমার দিকে।

কোহিমা খুব নির্জন। মানুষজন বেশি নেই। খুঁজে খুঁজে একটা হোমস্টে বের করলাম। হোমস্টের সামনে এক মহিলার সাথে দেখা হলো। গেটের সামনে হোজ পাইপ দিয়ে গাড়ি পরিষ্কার করছে। উজ্জ্বল বাদামি গায়ের রঙ, লম্বাকৃতির মধ্যবয়সী মহিলা। চেহারার গড়নে মঙ্গলয়েড ধাঁচ আছে। নাক চ্যাপ্টা, চোখগুলো গোল গোল আর মুখ খর্বাকৃতির। এক সময় হয়তো রূপবতী ছিলেন তবে বয়সের ভারে ওজন বেড়ে সেই সৌন্দর্য একটু ঢাকা পড়ে গেছে। আমাদের দেখে বুঝে গেলেন আমরা ট্যুরিস্ট এবং এখানে থাকতে এসেছি। ভেবেছিলাম হয়তো ভাষা পার্থক্যের কারণে কথা বলতে অসুবিধা হবে কিন্তু ভদ্রমহিলা চমৎকার ইংরেজিতে কথা বলেন। নিজের পরিচয় দিলেন রভি এবং এই বাড়িটা তাদের। তাদের বলতে তারা দুই বোন মিলে এই হোমস্টে দেখাশুনা করেন। আর দুজনের মধ্যে উনি ছোটো। আমাদের পরিচয় নিয়ে নিজেই রাস্তা দেখিয়ে আমাদের থাকার রুমে নিয়ে গেলেন।

পাহাড়ে যেমন খুব দ্রুত সন্ধ্যা নেমে যায় ঠিক তেমন খুব দ্রুতই সকাল হয়ে যায়। চোখ মেলে ঘড়ি না দেখে আন্দাজ করা খুব মুশকিল কয়টা বাজে। সকাল হতে হতে, ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপর মেঘ গুলো সরে যায়। আর এতো উচ্চতায় বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকায়ও হয়তো আলোর সহজেই বিকিরণ হয়।

মানুষ সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠতে শুরু করেছে। রাস্তায় এক দুজন মানুষ দেখা যাচ্ছে। যার যার প্রাত্যহিক কাজে বেড়িয়ে পরছে। অথবা যাওয়ার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে। ঘড়ি দেখে মনে হলো সময় হয়ে গেছে, আমাদের রেডি হওয়া প্রয়োজন।

যখন আমার ট্যুরমেট কে ঘুম থেকে জাগালাম তখন ৬ টা বেজে ৩০ মিনিটের কাছাকাছি। ফ্রেশ হয়ে আমরা বের হতে হতে প্রায় ৭ টা বেজে গেলো। আমরা নাস্তা শেষ করে গাড়িতে উঠার আগে রভি দিদি ডাক দিলেন। আমাকে কিছু ছবি হোয়াটস্যাপে দিয়ে বললেন এই ছবি গুলো দেখে দেখে যেন জুকোভ্যালির দিকে আগাই। পাহাড়ে উঠার সময় রাস্তা হারিয়ে ফেললে খুব বেগতিক অবস্থা হবে। আবার পাহাড়ে নেটওয়ার্কও পাওয়া যায় না সুতরাং রাস্তা খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে যায়। ব্যাপারটা দেখে খুব ভালো লাগলো। তবে চমক আরো বাকি ছিলো তখনো। আমাকে ডাক দিয়ে দাঁড়াতে বললেন। সে ঘর থেকে একটা কালো পলিথিনে মোড়ানো প্যাকেট এনে দিলেন। বললেন প্যাকেটে দুপুরের খাবার

আছে। পাহাড়ে উঠার সময় ক্ষুধা লাগলে যেন খেয়ে নেই।

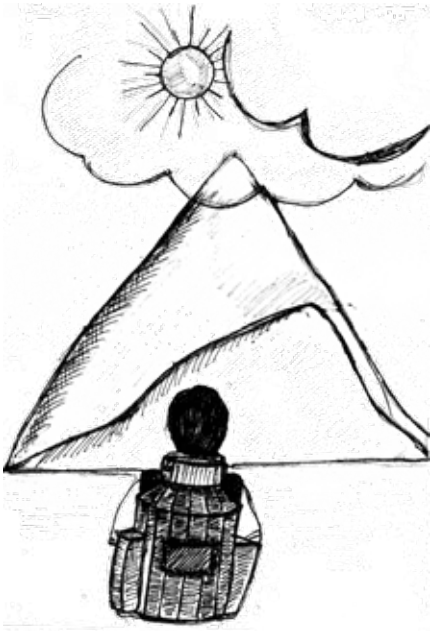

এই মুহূর্তে খুব আবেগ অনুভব করলাম। অচেনা অজানা একজন মহিলা কিভাবে খেয়াল রাখছে! অথচ তার সাথে আমার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। সে এতোকিছু না করলেও তাকে দোষ দেয়া যেতো না। দুপুরে যে খাবার কিছু সাথে করে নিতে হবে সেটা মনেই ছিলো না। হয়তো রাস্তায় যাওয়ার পথে ক্ষুধা লাগলে তখন মনে পড়তো। নিজের বোকামির জন্য হয়তো অলীক কে দোষ দিয়ে শেষমেষ দুপুরে না খেয়েই কাটিয়ে দিতাম। অবশ্য দুপুরে না খেয়ে কাটানোর অভ্যাস যে নেই তা বলা যাবে না।

ভার্সিটির প্রায় পুরোটা সময় দুপুরে না খেয়ে কাটিয়েছি। টং দোকানের চা-বিস্কুট আর রুটি কিংবা ক্যান্টিনের সিঙ্গারা বা সমুচা এর বেশি কিছু দুপুরে খেতাম না। সারাদিন টইটই করে ঘুরে সন্ধ্যের দিকে বাসায় গিয়ে মাকে বলতাম খাবার দিতে। এমনকি দেশের পাহাড়ে ট্র্যাকিং এ গেলেও একই ঘটনা হয়। সকালে পেট ভরে জুম চালের ভাত খেয়ে বের হলে সারাদিন পানি ছাড়া তেমন কিছু খাওয়া লাগে না। অনায়াসেই সন্ধ্যে পর্যন্ত থাকা যায়। সারা দিন ট্র্যাকিং করে সন্ধ্যায় পাড়ায় এসে আবার জুম চালের ভাত খেয়ে রাত ৭ টা কিংবা ৮ টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেই দিন শেষ হয়ে যায়।

এক গাল হেসে রভি দিদি কে ধন্যবাদ দিয়ে গাড়িতে উঠলাম। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ড্রাইভার গাড়ির ছাদে সবার ব্যাগ ভালো ভাবে বেঁধে নিচ্ছে। পাহাড়ি রাস্তা ব্যাগ না বাঁধলে পাহাড়ে উঠার সময় ব্যাগ সোজা খাদে গিয়ে পড়বে। গাড়িতে বসে বসে ভাবছিলাম দুনিয়ার মানুষ হয়তো একজন আরেকজনের থেকে ভিন্ন তবে আবেগ সবারই প্রায় এক। ভিন্নধর্মী মানুষ অভিন্ন রকমের আবেগ নিয়ে জীবন পার করে দেয়।

## ৩

গাড়ি থেকে নেমে প্রায় দুই ঘণ্টা পাহাড়ি দুর্গম চড়াই-উতরাই রাস্তা হাঁটার পর এক সময় জুকো ভ্যালির ডর্মেটরি চোখে পড়লো। পাহাড় আর সমুদ্রে অনেক দূরের জিনিস সহজেই চোখে পড়ে। তবে তার মানে এই নয় যে সেগুলো কাছে। দেখতে যত কাছে মনে হয় এগুলো তত দূরে হয়। সুতরাং কোন কিছু না ভেবে হাঁটতে রইলাম। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় পৌঁছে গেলাম জুকো ভ্যালির গেটের সামনে।

ভ্যালিতে গিয়ে রভি দিদির দেয়া খাবার খেয়ে রেস্ট নিতে গিয়ে কখন যেনো লম্বা একটা ঘুম দিয়ে ফেললাম। যখন ঘুম ভাঙলো বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ভালোই বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির কারণে বাইরে তেমন কেউ নেই। যারা ভ্যালি দেখতে বের হয়েছেন তারা ফিরে আসতে পারেনি। ভ্যালির ম্যানেজার বার বার খোঁজ নিচ্ছেন। আমার ট্যুরমেট আমার আগেই ঘুম থেকে জেগেছেন। তিনি বসে বসে বৃষ্টি দেখছেন। আমাকে উঠে বসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন এখন কী করবো? সারা বিকেল বসে থাকবো? আমি ঘড়িতে সময় দেখলাম। বিকেল প্রায় ৪ টা। আরো আধা ঘণ্টা সময় নিয়ে বৃষ্টির অবস্থা দেখা যেতে পারে। এর মধ্যে বৃষ্টি কমলে আমরা রওনা দিবো ভ্যালি দেখতে। ভ্যালিতে যেতে ১ ঘণ্টা সময় লাগে আর পাহাড় বেয়ে ফিরে আসতে ২ ঘণ্টা সময় লাগে। অর্থাৎ ৫ টায় রওনা করতে পারলে ৬ টার মধ্যে পৌঁছে যাবো আর আধা ঘণ্টা থেকে সাড়ে ছটায় রওনা করলে ৮ টা ৩০ নাগাদ পৌঁছে যাবো। প্ল্যান খারাপ না তবে পারবো কিনা দুই জনের কেউই বলতে পারলাম না।

বৃষ্টি কমলে, আধা ঘণ্টার মধ্যে আমি আর আনোয়ার ভাই রেডি হয়ে নিলাম। ব্যাগ থেকে টর্চ লাইট আর পাঞ্চো টা বের করে গায়ে দিয়ে নিলাম। দুজনের কেউ ই রাস্তা চিনি না। যারা গিয়েছিলো এমন একজনের কাছ থেকে রাস্তা জেনে নিলাম। এরপর দুজনে ঢুকে গেলাম বড়ো বড়ো লতার মত বাঁশ গাছের লম্বা লম্বা পাতা দিয়ে মোড়ানো একটা সুরঙ্গের মত ট্রেইলে। ডানে বা বামে কিছুই দেখা যাচ্ছে না ঘন পাতার কারণে। যেতে যেতে এক সময় পৌঁছলাম হেলিপ্যাডে। জুকোভ্যালি থেকে এই অংশ টা দেখা যায়। চাইলে কেউ হেলিকপ্টারে করে এখানে আসতে পারবে এবং এখান থেকে ভিউটাও চমৎকার।

কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে একটু শ্বাস নিলাম। জুকোভ্যালির ভিউপয়েন্ট যেটাকে কেইভ বলে সে জায়গাটা একবার দেখে নিলাম। সোজা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নামার রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। একটু খুঁজতেই লতা পাতার মধ্যে ছোটো একটা ট্রেইলের দাগ চোখে পড়লো। দেরি না করে নেমে পড়লাম। দ্রুত পৌঁছতে হবে। এক সময় মনে হলো রীতিমতো দৌড়াচ্ছি আমরা দুইজন। গায়ের সাথে ভেজা লতা আর পাতা ঘষা খাচ্ছে। লতা গুলো কোথাও কোথাও ৪ ফুট আবার কোথাও কোথাও

৭ থেকে ৮ ফুট লম্বা। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও উপর থেকে দেখা সম্ভব না। পাতা থেকে পানি এসে পাঞ্চোতে লাগছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাঞ্চো থেকে পানি গড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। গড়িয়ে গড়িয়ে পড়া পানিতে আমার কেডস ভিজে গেছে ততক্ষণে। যাইহোক, এতোকিছু দেখার সময় নেই। বারবারই মনে হচ্ছিলো দ্রুত এগোতে হবে। সময় খুব কম আর তার চেয়ে কম দিনের আলো।

আধা ঘণ্টার মতো লতা পাতার মধ্যে দিয়ে হাঁটার পর ভ্যালির কিনারায় একটা পাথরের উপর এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে ভ্যালি আর ডর্মিটরি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দেখে মনে হলো মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছে গেছি। যে পাথরটার উপর দাঁড়িয়ে আছি তার ঠিক ৪০-৫০ ফুট নিচেই ছড়া। হিম শীতল ছড়া। ছড়ার তীব্র আওয়াজ কানে আসছে। এখানে পরে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু। এমনকি শরীরের অংশ গুলোও খুঁজে পাওয়া যাবে না হয়তো। ব্যাপারটা ভাবতেই শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেলো। একটু শ্বাস নিয়ে আবার এগিয়ে চললাম। এ যেনো সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ছুটে চলা।

আরো প্রায় ১০-১৫ মিনিট পাহাড় বেয়ে নিচে নামার পর সমতল চোখে পড়লো। এখানে লতা পাতা আর বাঁশ গাছগুলোর উচ্চতা কিছুটা কম। ৩ থেকে ৪ ফুট হবে। সুতরাং আসে পাশের সব কিছুই দেখা যায়। সামনে একটা রাউন্ড জায়গা চোখে পড়লো। কে বা কারা ঘাস লতা পাতা কেটে স্তুপ করে রেখেছে। তার চারপাশের গাছগুলো দুমড়ে মুচড়ে শোয়ানো। আপাতত খুব বেশি একটা কিছু ভাবতে ইচ্ছে হলো না। তবে যেটা আরো বেশি আকৃষ্ট করলো সেটা হলো এর একটু সামনেই ছড়ার সাথেই একটা এপিটাফ। প্রকৃতি সবুজের কার্পেট দিয়ে পুরো গ্রেভটাকে আপন করে নিয়েছে। হাড় রক্ত মাংস সব মৃত্তিকা গ্রাস করে নিয়েছে শুধু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটি আর্চ শেপের লাইমস্টোনের এপিটাফ। দূর থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে না কী লেখা আছে এপিটাফে। কালের সাথে সাথে হয়তো কালি ও উবে গেছে। কাছে গেলে হয়তো লেখার ছাপটাই শুধু চোখে পড়বে।

খুব একটা সামনে যেতে পারলাম না। হাতে সময় থাকলে একটা লিলি ছিঁড়ে এপিটাফে রেখে আসতে পারতাম। একাকি শান্ত আর ভ্যালির নিবিড়তায় ঘুমন্ত মনকে একটি ফুলাঞ্জলী। হাঁটতে হাঁটতে অনেক কিছু মাথায় আসছে। কে এই ভদ্রলোক? পুরুষ নাকি মহিলা? কেনই বা এই নির্জন ভ্যালিতে তাকে একা কবর দিতে হলো? কিভাবেই বা তার মৃত্যু হলো? অনেক প্রশ্ন তবে প্রশ্নের উত্তর নেই। লোকমুখে প্রচলিত আছে এই ভ্যালিতে একটা মেয়ে আত্মা বাস করে। প্রতি বছর এই আত্মা একটি করে জীবন নিয়ে নেয়। যারা ঘুরতে আসে তারা অনেকেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঠিক চিকিৎসা না হলে আরো অসুস্থ হয়ে যান। এক সময়

তারা এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। এই কারণে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে দেরি না করে তাকে এখান থেকে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

জুকোভ্যালির ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় কালো রঙ্গের একটা বিশালাকার পাথর। এই পাথরকে এখানকার কেইভ রক বলা হয়। এর চারপাশে গাছ পালার ঝোপ। যেদিকেই চোখ যায় শুধু সবুজের ছড়াছড়ি। হেঁটে হেঁটে যখন কেইভের উপরে উঠলাম তখন আমার চক্ষু চরক গাছ। দুই চোখ যতদূর যায় শুধু সবুজের চাদরে মোড়ানো ছোটো ছোটো পাহাড়ি টিলা। প্রকৃতি যেনো শান্ত হয়ে চাদর গায়ে ঘুমিয়ে আছে। এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে অকবিও হয়ে ওঠেন কবি, অপ্রেমিকও হয়ে ওঠেন প্রেমিক, একজন সচেতনও অবচেতনে হয়ে ওঠেন উন্মাতাল, একজন বৃদ্ধও সবুজের সুরা পান করে হয়ে ওঠেন তেজোদীপ্ত তরুণ।

কিছুক্ষণ চোখ জুড়ে প্রকৃতি দেখে নিয়ে উঠে পড়লাম। সুর্য ডুবে গেছে কিছুক্ষণ আগেই। আমরা যখন এসেছিলাম তখনও পশ্চিম আকাশে সূর্য ছিলো। সূর্যের রশ্মি ফিনকি দিয়ে ছড়িয়ে পরছিলো ভ্যালিতে। এখন আর সেই সূর্য নেই। আলো কমতে শুরু করেছে। সুতরাং আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। খরোস্রোতা একটা খাল পার হতে হতেই অন্ধকার নামা শুরু হয়ে গেলো। চলার পথে একটু থেমে নিয়ে পকেট থেকে টর্চ লাইটটা বের করে জ্বালিয়ে নিলাম। দুইজন মানুষ তবে লাইট একটা। সুতরাং দুইজনকে পাশাপাশিই হাঁটতে হচ্ছে। এদিকে অন্ধকার নেমে আসায় খুব ভালো দেখাও যাচ্ছে না। কিছুটা অনুমানের উপর ভিত্তি করেই এগিয়ে যাচ্ছি দ্রুতপায়ে।

এই পাহাড়ে উতরাই যতটা সুবিধাজনক ছিলো চড়াই ততটা সহজ না। গ্রাভিটি আমাকে কতটুকু আকর্ষণ করছে তা প্রতিটা পদে পদে টের পাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পর মনে হচ্ছিলো পেছন থেকে কেউ চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে টেনে ধরছে। এক পা ফেলার পর আরেক পা ফেলতে শরীরের সব শক্তি ব্যায় হয়ে যাচ্ছে। এমন ভাবে প্রায় বিশ মিনিট হাঁটার পর আমি থেমে গেলাম। আর এক চুলও আগানো যাচ্ছে না। বুকের ভিতরে হৃদযন্ত্র সর্বশক্তি দিয়ে দ্রুততার সাথে বিট করছে। হার্টবিট এভাবে থাকলে শরীর দ্রুতই দুর্বল হয়ে যাবে। এক সময় আর এগোতে পারবো না বা আরো খারাপ কিছু হবারও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এভাবে হুট-হাট থামাও যাচ্ছে না খুব বেশি একটা, কারণ দেরি হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে আবার যদি বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় তাহলে আর গতি থাকবে না। হাতের টর্চ লাইটটা কি ওয়াটার রেসিসট্যান্ট নাকি সেটা ও জানি না তবে এই মুহূর্তে পরীক্ষা করে দেখারও ন্যূনতম ইচ্ছে নেই।

কয়েকবার রেস্ট নিয়ে হেঁটে হেঁটে অনেকটা উপরে উঠলাম। পুরোটা সময় ডানে বায়ে বা উপরে তাকানোর সুযোগ

পাইনি। যেখানে পা রাখছি সেখানটা দেখেই এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ থেমে আশেপাশের পরিবেশ দেখে নিলাম। আশপাশ দেখতেই ঘাবড়ে গেলাম। যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলাম সে রাস্তায় এমন বড়ো কাষ্ঠল গাছপালা চোখে পড়েনি। তবে আচমকাই কথাটা বললাম না। ট্যুরমেট আনোয়ার ভাই আমার দিকে তাকালেন। শেষমেশ বলেই ফেললেন আমরা যে এখান দিয়ে যাইনি।

টর্চ লাইটের ব্যাটারির চার্জ খুব বেশি একটা নেই। কপাল ভালো থাকলে হয়তো আরো বিশ মিনিটের মতো জ্বলবে। আলো বেশি রাখার জন্য আমাকে এখন একটু পর পর টর্চ লাইট বন্ধ করে জ্বালাতে হচ্ছে। এই পর্যায়ে যদি পিছনে ফিরে রাস্তা খুঁজতে হয় তাহলে হয়তো আজ রাতে আর ডর্মিটরিতে ফেরা হবে না। অন্ধকারে এই পথে আগানো সম্ভব না। আবার ফোনের ফ্ল্যাশ দিয়েও খুব বেশি একটা কাজ হয় না। কারণ ফ্ল্যাশ লাইট ছড়িয়ে পরে, কোন ফোকাল পয়েন্ট নেই। যার কারণে এক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অবস্থার এই পর্যায়ে আমি তাকে সাহস দিয়ে বললাম যে নামার সময় দ্রুত নেমেছি হয়তো এগুলো খেয়াল করিনি। হয়তো ছিলো কিন্তু আমরা এড়িয়ে গেছি। আনোয়ার ভাই মনে হয় খুব বেশি একটা খুশি হলো না এই উত্তরে তবে কিছুই করার নেই। উনিও জানেন এই মুহূর্তে পিছনে ফিরে গিয়ে রাস্তা খুঁজে বের করাও সম্ভব না। আর যেহেতু ট্রেইল উপরেই যাচ্ছে এর মানে পাহাড়ের উপরেই উঠছি। কোন একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দেখে নিতে হবে ঠিক কোন ট্রেইল ধরে এগোলে ডর্মিটরিতে ফিরে যেতে পারবো। সুতরাং আমরা এগিয়ে চললাম।

অল্প কিছুক্ষণ দ্রুত পায়ে হাঁটলাম। হঠাৎই দেখলাম বাঁশ গাছের ঝোপ শেষ হয়ে গেলো। একেবারে উন্মুক্ত স্থানে চলে আসলাম। ডানে তাকিয়ে দেখি ডর্মিটরি। আরে! আমরা তো হেলিপ্যাডেই গেলাম না তাহলে এখানে কীভাবে এলাম! পরে বুঝলাম আমরা আসলে হেলিপ্যাডে না গিয়ে তার নিচে দিয়ে ঘুরে শর্টকাট রাস্তায় ফিরে এসেছি। এতে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা সময় কম লেগেছে। আমরা সোয়া সাতটার মধ্যেই ডর্মিটরিতে পৌঁছাতে পেরেছি।

## ৪

উঠার পথটা যতটা কঠিন নামার পথটা মনে হয় আরো বেশি কঠিন। হয়তো দ্রুত নামা যায় বিধায় অনেকের কাছে সহজ মনে হয় কিন্তু এর মধ্যেই অনেক বিপদ লুকিয়ে থাকে। একটু অসতর্ক ভাবে নামলেই ভীষণ বিপদ হয়ে যেতে পারে। নামার সময় পা স্লিপ কাটা একটা খুব সাধারণ ঘটনা। অনেক মানুষ ডাউন হিলে আসার সময় চোট খেয়ে দুর্ঘটনায় পরেছেন এমন উদাহরণ অনেক। বিশেষ করে নামার সময় এই ব্যাপারটা বেশি করে টের পেলাম।

যাইহোক, আমি ঠিক আগের মতোই সময় নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলছি।

যাওয়ার সময় যেমন ডর্মিটরিতে পৌঁছানোর তাড়া ছিলো এখন সেটা নেই। নেমে গেলেই তো চলে গেলাম সেই লোকালয়ে। পাহাড়ের হাওয়া বাতাস, ঝর্নার হিমশীতল পানি, মেঘের আলো ছায়ার খেলা আর বাতাসের খুনশুটি পাবো না। তারপরেও ঘরে ফিরে যেতে হয়। ব্যাস্ততায় গা মিলিয়ে দিতে হয়। সময় আপন মনে এগিয়ে চলে আমাদের নিয়ে।

ধীরে ধীরে খাড়া পাহাড় বেয়ে নেমে পড়লাম। উঠার সময় যতটুকু খাড়া অনুভূত হয় নামার সময় তার চেয়ে বেশি হয়। হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায় কত উপরে উঠেছিলাম। নামতে নামতে আমার মত অনেক ট্যুরিস্ট এর সাথে দেখা হয়ে গেলো। অনেকে হায় হ্যালো বলে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। অনেকে কোত্থেকে এসেছি জিজ্ঞাসা করছে। উত্তর শুনে গুডলাক জানিয়ে চলে যাচ্ছে। আসাম আর কলকাতার বাঙালিরা সামান্য কৌতূহল নিয়ে এটা সেটা জিজ্ঞাসা করছে। সম্ভবত একই ভাষায় কথা বলি বলে আর পূর্বপুরুষ একই অঞ্চলের ছিলো বলেই এই আকর্ষণ অনুভূত হয় কিন্তু আদতে নিজেদের মধ্যে আমরা সম্পর্কের ফাটল ধরিয়ে কৃষ্টি কালচারের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যোজন যোজন দূরে চলে গেছি। এ খবর আমরা জানি না। এক সাথে কথা বলতে বসলে তখন বুঝে আসে।

মানুষ চলে তার প্রবৃত্তি দিয়ে আর এই প্রবৃত্তিই শরীর মন সব কিছুকে ঠেলে ঠেলে সামনে নিয়ে যায়। অন্ধকার রাতে তীব্র আলো পতঙ্গবৃত্তির কারণ হয়। ছোটো বড়ো পতঙ্গগুলো প্রবৃত্তির কারণে নিজেদের অজান্তেই জীবননাশ ঘটায়। তারা চাইলেই অন্যদিকে ছুটতে পারে না। ঘুরে ফিরে এক স্থানেই ফিরে আসে। যাওয়ার সময় প্রবৃত্তি আমাকে নিয়ে গেছে অনেক দূর। দূরত্বটা একেবারেই গায়ে লাগেনি, হয়তো বুঝেও উঠতে পারিনি। তবে ফেরার রাস্তাটা খুব বিষণ্নময়। মায়ায় পড়ে গেলে হয়তো মানুষ এমন বিষণ্নতায় পড়ে যায়। সত্যজিৎ রায়ের অপু এমন মায়ায় পড়ে গিয়ে তার ভিটামাটি ত্যাগ করে শহরে এসেছিলো। একদিন সে মায়ায় পড়ে বিয়ে করেছিলো। মায়াছিন্ন হয়ে গেলে সংসার ত্যাগ করে একাকীত্ব গ্রহণ করেছিলো। আবার সেই মায়াতেই আটকে গিয়ে সংসারে ফিরে এসেছিলো পুত্রের হাত ধরে। মানুষ মায়ার কাছে বড়ো অসহায়।

এক সময় দেখতে দেখতে প্রায় দুইদিন ছুটে চলার পর সেই ডাউকি এসে পৌঁছলাম। ঠিক যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। ডাউকির খাসিয়াপল্লী পার হয়ে পাহাড়ের উপর থেকে বাংলাদেশের সুনামগঞ্জের টাংগুয়ার হাওর দেখা যায়। পাহাড়ের পায়ে পানি এসে চুমু খাচ্ছে। দেশ থেকে দূরে না থাকলে দেশের মায়া বুঝা যায় না। ঠিক যেমন বিরহ না থাকলে প্রণয়ের আনন্দ উপলব্ধি হয় না। অনেক দিন পর দেশকে দেখার পর আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। আমার দেশে চলে এসেছি। এক মায়া থেকে আরেক মায়ার জালে।

# তৃতীয় ত্রৈমাসিক

ডা. মো. দিদারুল করিম
মেডিক্যাল অফিসার
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

'মাতৃত্বের স্বাদ নেয়া ছাড়া নারী জীবন বৃথা'- আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে একদম খাঁটি কথা। একজন বিবাহিত নারী সন্তান জন্ম না দিতে পারলে অথবা জন্মগত ত্রুটিপূর্ণ সন্তান অথবা মৃত সন্তান জন্ম দিলে কত যে লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের শিকার হতে হয় তার কোনো হিসাব নাই। প্রজন্মের ধারা বজায় রাখতে মাতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। সমগ্র গর্ভকালীন সময় অর্থাৎ ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া থেকে শুরু করে সন্তান প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত (নয়মাস দশ দিন) গর্ভবতী মা ও তাঁর গর্ভের বাচ্চার যত্ন নেওয়াকে গর্ভকালীন যত্ন বলা হয়। গর্ভকালে মায়ের সঠিক যত্ন নিলে মা সুস্থ থাকে, সুস্থ সবল শিশুর জন্ম হয়, নবজাতকের ও মায়ের মৃত্যুঝুঁকি হ্রাস পায়।

গর্ভাবস্থাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে থাকি।

১। প্রথম ত্রৈমাসিক (First Trimester)
২। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (Second Trimester)
৩। তৃতীয় ত্রৈমাসিক (Third Trimester)

সাম্প্রতিক তৃতীয় ত্রৈমাসিকের বেশ কিছু ঘটনা নবজাতকের মৃত্যু কিংবা প্রসবকালীন বা প্রসব পরবর্তী মাতৃমৃত্যু বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। এ সময়ে দূরের পথে ভ্রমণ না করাই ভালো। বহুতল ভবনে ওঠার ক্ষেত্রে লিফট ব্যবহার করতে হবে। যেখানে লিফটের সুবিধা নেই সেখানে সময় নিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ব্যবহার করে খুব সাবধানে উঠতে হবে। এ সময়ে ভারী কাজ যেমন- কাপড় কাচা, ঘর মোছা, ভারী কিছু বহন করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। ঝুঁকে কাজ করতে হয় এমন কাজও বাদ দিতে হবে। এসময়ে গভীর শারীরিক সম্পর্ক (সঙ্গম) থেকে বিরত

থাকতে হবে। এ সময়ে গর্ভপাতের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি থাকে। বাচ্চার নড়াচড়া খেয়াল রাখা খুবই জরুরি। বাচ্চার নড়াচড়া গণনার সবচেয়ে ভালো সময় হলো দুপুরে ভরপেট খেয়ে বাঁ কাতে শুয়ে বিশ্রামের সময়। প্রতি ঘণ্টায় অন্তত পাঁচবার নড়াচড়া করা স্বাভাবিক। কোন কারণে এর কম হলে প্রসূতি ও ধাত্রী বিদ্যা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। দিনের বেলা কমপক্ষে দুই ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে হবে। কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে প্রচুর শাক-সবজি খেতে হবে। প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ গ্লাস পানি পান করতে হবে। সুতি কাপড়ের তৈরি পোশাক পরিধান করতে হবে। হাতের নখ ছোটো ও পরিষ্কার রাখতে হবে। যেসব ফল বা সবজি কাঁচা অবস্থায় খাওয়া হয় তা ভালো করে ধুয়ে খেতে হবে। শাক-সবজি, মাছ-মাংস ভালো করে সিদ্ধ ও রান্না করে খেতে হবে। গর্ভাবস্থায় কোন প্রকার কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়া যাবে না। গর্ভে বেড়ে ওঠা বাচ্চার বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার যেমন-মাছ, মাংস, দুধ, ডিম খেতে হবে। এছাড়াও আয়রন সমৃদ্ধ খাবার যেমন-লাল শাক, কচু শাক, কলা(কাঁচা/পাকা), পেয়ারা, আপেল, কলিজা, ইত্যাদি খেতে হবে। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার যেমন- দুধ, মিষ্টি, পনির, দই, ইত্যাদি খেতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আয়রন ক্যাপসুল ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে খেতে হবে। গর্ভাবস্থায় খাবার নিয়ে রয়েছে বেশকিছু বিধিনিষেধ। আনারস, পেঁপে, চা, কফি, কোমলপানীয়, পান, সুপারি, জর্দা, তামাক জাতীয় খাবার খাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। এছাড়াও গ্রামে বেশ কিছু কুসংস্কার প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটি হলো গর্ভবতী মাকে বেশি খাবার দেওয়া যাবে না। কারণ হিসেবে তারা বলেন, এতে বাচ্চা বেশি বড়ো হয়ে যায় ফলে সন্তান প্রসবে সমস্যা হয়। যা একটি ভিত্তিহীন ধারণা ছাড়া আর কিছুই না। মূলত তৃতীয় ত্রৈমাসিক চলাকালীন গর্ভবতী মাকে বেশি বেশি খাবার খেতে হবে কারণ বাচ্চার বেশির ভাগ বৃদ্ধি হয় এই সময়ে। কুসংস্কার শুধু গ্রামেই নয়, শহরেও প্রচলিত আছে।

গর্ভাবস্থায় শেষদিকে পাঁচটি বিপদ চিহ্ন দেখা দিতে পারে। যেমন (১) প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা, (২) রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া, (৩) খিঁচুনি (৪) পা ফুলে যাওয়া, (৫) মাসিকের রাস্তা দিয়ে রক্ত বা বাচ্চার কোন একটা অংশ বের হয়ে আসা। এর যেকোনো একটি বা একাধিক সমস্যা দেখা দিলে নিকটস্থ ভালো কোন হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হবে। বাসা থেকে হাসপাতাল দূরে হলে গাড়ির (সিএনজি/অটো/এ্যাম্বুলেন্স/ভ্যান/রিক্সা) ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে। গর্ভবতী মায়ের রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী দুইজন রক্তদাতা আগে থেকেই প্রস্তুত রাখতে হবে। প্রসবের সময় অতিরিক্ত রক্তপাত হলে তাঁরা যেন রক্ত দিতে পারে। গর্ভবতী মায়ের রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ হলে "অ্যান্টি ডি" ইনজেকশনের ব্যবস্থা আগে থেকেই করে

রাখতে হবে। সন্তান জন্মের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মাকে এই ইনজেকশন দিতে হয়। না দিলে পরবর্তী (দ্বিতীয়) বাচ্চার নানান রকম জটিলতা দেখা দেয় এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। কিছু নগদ টাকা বাসার একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা রাখতে হবে। ঐ জায়গা সম্পর্কে শুধুমাত্র গর্ভবতী মা জানবে। অনেক সময় দেখা যায় যে গর্ভবতী মায়ের স্বামীর কিছু বাজে অভ্যাসের (মাদকাসক্তি/জুয়ার নেশা) কারণে নগদ টাকা ভেঙে ফেলে। আবার কেউ কেউ নগদ টাকা দিয়ে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি কেনে। ফলে প্রয়োজনের সময় ঐ টাকা আর পাওয়া যায়না। হাসপাতালের কারও মোবাইল নাম্বার রাখতে হবে। প্রয়োজনে যোগাযোগ রাখতে হবে।

সকল প্রকার জটিলতা এড়াতে প্রতিটি পরিবারের উচিত নিরাপদ প্রসব পরিকল্পনা করা। যেমন- কোথায়, কাকে, দিয়ে প্রসব করানো হবে তা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে। কিছু প্রসব পূর্ববর্তী পরীক্ষা, যেমন- CBC, BLOOD GROUPING & Rh TYPING, RBS, HBsAg, URINE R/M/E, VDRL, SERUM CREATININ, ULTRASONOGRAM OF PREGNANCY PROFILE, ECG, ইত্যাদি করাতে হবে। প্রসব বেদনা ওঠার সাথে সাথে সকল প্রকার জটিলতা এড়াতে হাসপাতালে গিয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে হবে। কোনভাবেই বাসায় ধাত্রী দিয়ে অযথা সময় নষ্ট করা যাবে না। এসময় গর্ভবতী মা তার গর্ভের বাচ্চা কীভাবে পৃথিবীতে আসবে সেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিজেই নেবেন। এ সময়ে স্বাভাবিক সন্তান প্রসবের জন্য শাশুড়ি, নানি-দাদিরা নানান কান কথায় (যেমন- আমাগো সময় ১০টা-১২টা কইরা বাচ্চা নিছি সবই এমনেই হইছে, কী যে যুগ আইলো হাসপাতাল ছাড়া চলেই না) পরিস্থিতি জটিল করে ফেলে। সে সময় (নানি-দাদির আমলের) শারীরিক সক্ষমতা আর এখনকার সময়ের শারীরিক সক্ষমতা এক নয় এটাও বুঝতে হবে। গর্ভবতী মাকে বুঝতে হবে নয় মাস দশ দিন তার গর্ভে বাচ্চা ধারণ করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় একে পৃথিবীর মুখ দেখানোটাও বড়ো একটা দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। এখানে কান কথায় কান দেওয়া অযৌক্তিক। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্তান জন্মের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নবজাতকের মাকে প্রজেস্টেরন সমৃদ্ধ বড়ি (আপন) খাওয়া শুরু করতে হবে। এই বড়ি প্রতিদিন রাতে একটি করে খেতে হবে ৬ মাস পর্যন্ত। ৬ মাস পর যেকোনো একটি জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি - যেমন মেয়েদের জন্য খাবার বড়ি (সুখী) অথবা ইনজেকশন (স্বস্তি) অথবা ছেলেদের জন্য কনডম (নিরাপদ) ব্যবহার করতে হবে।

সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির পেছনে কী রহস্য আছে তা একমাত্র তিনিই জানেন। তাঁর উপর ভরসা রাখুন, তিনি যা মঙ্গলজনক তাই আমাদের দান করেন। তিনি প্রতিটি সন্তান প্রসবকে সহজ ও নিরাপদ করুন এবং পরিবারের মধ্যে সুখ-শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন (আমিন)।

# বৃষ্টিকাব্য

মো. সজল মিয়া
সুপারভাইজার, সুইং
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

বৃষ্টিস্নাত সকাল
হাঁসের গান শোনে সবাই,
মেঘের আলো ছাড়িয়ে
পৃথিবীতে তোলে উজ্জ্বল আলোর দাগ।

গোধুলির গন্ধ মিশিয়ে
আকাশ মেঘের মধ্য দিয়ে,
সবুজ পাতায় পানির ছায়া
সুরময় শহরের অলিগলিতে ঢালে
মাতানো মুগ্ধ ছায়া।

মন ভরিয়ে দেয় আনন্দের স্পর্শ
সুখের বৃষ্টি আসে প্রকৃতির স্বর্গের আঙিনায়,
প্রেম বৃষ্টির জল ঝরে
প্রেমের পরশ পাথর চিরে।

মেঘের মেলা বাড়ায় রঙিন ছায়া
বনে সবুজ রঙের খেলা,
বৃষ্টিতে হাওয়া জমে ওঠে
গায়ে শহরের গীত ছড়িয়ে।

সকালের মেঘের আলোয়
প্রেমের স্পর্শ হাতে হাত ধরে,
পরবাসী মেঘের আলো,
ছুঁয়ে দেয় সবাইকে আনন্দময় জীবনের গানে।

# স্মৃতিতে রবে তুমি

বদিউল আলম
সিনিয়র অফিসার, সেন্ট্রাল স্টোর
অবনী টেক্সটাইলস লিমিটেড

তখন তোমার দুরন্ত যৌবন। বয়স কত হবে? ঊনিশ কিংবা কুড়ি।
আমার ছিল জীবনের মধ্যগগন, ছত্রিশ বা সাইত্রিশ ।
লোকমুখে তোমার সুখ্যাতি, যশ ও গুনগান শুনে-তোমাকে ভালোবেসে ফেললাম।
তারপর পাওয়ার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে একদিন পেয়েও গেলাম।
তোমাকে পেয়ে বুঝেছিলাম তুমি মহান, অপরূপা-অনন্যা,
তোমাকে ভাল না বেসে পারে, এমন সাধ্য কার?

সেই থেকে আমাদের হৃদয়ের নিবিড় বন্ধন-
গভীর প্রণয় আর মগ্নতায় কেটে গেছে কতকাল-
কত সুখে-দুখে, কত মান-অভিমানে সময় বয়ে গেছে।
ভালোবাসায় যেমন সুখ থাকে, তেমনি কিছু অপূর্ণতার কষ্ঠও থাকে,
কতদিন ভেবেছি-তোমাকে ছেড়ে চলে যাব, কিন্তু পারলাম না।
অদৃশ্য এক মায়াডোরের বাঁধন ছিন্ন করা গেলো না।

তুমি বিশাল বটবৃক্ষের মতো ছায়া দিয়ে কত পথহারা কত দুখীজনকে তৃপ্ত করেছো।
যে মমতার বাঁধনে বেঁধে রেখেছো, সে বাঁধন ছিন্ন করা কঠিন।
জানিনা তোমার স্নেহের আঁচলে জীবনযুদ্ধে হার-না-মানা একঝাঁক যোদ্ধাদের সাথে
আর কতদিন স্বপ্ন বুনে যাব।
সময়ের চাকায় ঘুরে জীবনের স্রোত একদিন থেমে যাবে, এ মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে-
হয়তো কোনোদিন চলে যাব দূরে বহুদূরে। শুধু স্মৃতিগুলো বুকে করে নিয়ে যাব।
যতদিন জীবন হবে স্মৃতিতে রবে তুমি অম্লান-হে প্রিয় ব্যাবিলন।

# এক টুকরো গল্প

এসএম এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক
ব্যাবিলন গ্রুপ

সে বেশ আগের কথা। গত শতাব্দির আশির দশকের কথা, যখন ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে সড়কপথে দুখানা ফেরি পড়তো। দাউদকান্দির ও মেঘনাঘাটের সেতু তখনও হয়নি। ভার্সিটি শেষ করেছি ঢাকায়, চাকরি করছি চট্টগ্রাম শহরে একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। মাঝেমধ্যে ঢাকা চিটাগাং করতে হয়। ট্রেনে যাতায়াত খুব কম। দামপাড়া থেকে বাসে উঠি, সেটাই সহজ। সেরকম একবার আসছিলাম ঢাকার দিকে। তখনকার দিনের বাসে কথায় কথায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকতো না।

সিট পড়েছে বাসের মাঝামাঝি বাঁ দিকে, তবে জানালা ঘেঁষে নয়, মাঝখানের আইল ঘেঁষে।

চিটাগাং থেকে ঢাকা লম্বা সময় লাগে – সাত থেকে আট ঘণ্টার কম নয়। সময় কাটাবার জন্য হাতে আমার একটা রহস্যপত্রিকা –হালের। গ্রীষ্মের এক সকাল। আলো ঝলমলে একটা দিন। স্লাইড করে বন্ধ করতে হয় ও খুলতে হয় ধরনের জানালাগুলো খোলা। বাস চলতে শুরু করলে ধুলা কিছুটা আসে বটে, তবে বাতাস আসে প্রচুর, যেটা দরকার। জানি, কিছু পরে অনেক যাত্রীর চোখেই গাড়ির দুলুনিতে ও বাইরের বাতাসের পরশে ঢুলুনি চলে আসবে। আমার আসে না। পত্রিকাটাই আমার এক মাত্র ভরসা। আমার পাশে জানালার কাছে বয়স্ক একজন বসেছে। এর সাথে আলাপ জমাবার কোনও চেষ্টাই আমি করবো না। কম বয়সের কেউ হলেই যে তা আমি করতাম এমনও নয়। আসলে আমি বেশ লাজুক ও মুখচোরা ধরনের। গাড়ির ঝাঁকুনিতে একটানা অনেকক্ষণ বইয়ের পাতায় চোখ আটকে রাখা যায় না। তাই কিছুক্ষণ পর পর বাইরে তাকাই, কখনও বাসের ভেতরেও মাথা ঘুরিয়ে দেখি। চট্টগ্রাম থেকে আসা বাসে স্থানীয়দের বেশ ক'জন থাকে। আমাদের বাসেও আছে। মাঝে মাঝে এরা কেউ কথা বলে ওঠে পাশের যাত্রীর উদ্দেশে বা সহযাত্রী সঙ্গীর সাথে। অনেককাল চিটাগাং শহরে বসবাস সত্ত্বেও এদের সব কথা বুঝি না আমি, ধীরে ধীরে বললেও না। পরে জেনেছি এদের আসলে নিজস্ব কিছু শব্দই আছে যা না জানা থাকলে অন্যের বোঝার সাধ্য নেই। সে সব জানার সুযোগ আমার হয়নি, সেই চেষ্টাও আমি করিনি অবশ্য।

ওয়াক ওয়াক করে আমাদের দুই সারি পেছনে জানালার পাশে বসা এক

অল্পবয়সি মেয়ে বমি করেছে জানালার বাইরে মুখ নিয়ে। ভাগ্যিস মেয়েটা আমাদের সামনের সিটে বসেনি, তাহলে হয়তো সেই বমির ছিটেফোঁটা আমার পাশের বয়স্ক যাত্রীর ভাগেও কিছুটা পড়তো। অনেকেই, বিশেষ করে মেয়েরা, গাড়ির ঝাঁকুনি সহ্য করতে পারে না। এক সময় পাকস্থলি থেকে বমি উঠে আসে তাদের। এর একটা বড়ো কারণ হলো বাসে ওঠার আগে বাসা থেকে পেট ভরে খেয়ে আসে এরা। কে বোঝাবে যে এটা ঠিক নয় – ভাবি আমি। আমি বলতে গেলে কিছুই খাইনি। সামনে ফেনীতে গাড়ি থামলে সেখানে রেস্টর‍্যান্ট থেকে পরাটা, ডিম ভাজা খাবো ভাবছি। এ সব রেস্টর‍্যান্টের নাশতা খুব মজার হয়, চা-টাও। তখনপর্যন্ত কফির খুব চল হয়নি।

আমার সামনে ডান দিকে এক সারি আগে অল্পবয়সি একটি মেয়ে বসেছে, পাশে বালক বয়সি একটি ছেলে। জানালার পাশে সিট হওয়ায় ছেলেটিকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। মাঝেমধ্যে সে তার বড়ো বোনের উদ্দেশে কিছু বললে তার কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। মেয়েটির বয়স

খুব কম, দেখতে ভীষণ সুন্দর, এটা আমি মেয়েটিকে আচমকা এক ঝলক দেখেই বুঝতে পেরেছি। এমনিতে নিজ থেকে সরাসরি বা এমনকি অপাঙ্গে যুবতি মেয়েদের দিকে তাকাবার সাহস আমার নেই। এই জন্যই কলেজ বা ভার্সিটিতে মেয়েদের সাথে আমার কোনও রোমান্টিক সম্পর্ক হয়নি। অথচ আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি ভেতরে ভেতরে আমার চাইতে রোমান্টিক পুরুষ আর হয় না। কিন্তু মেয়েরা তা জানবে কী করে? মেয়েদের দিক থেকেও আমার প্রতি কারও কোনও বিশেষ সুনজর টের পাইনি কখনও। আর সেটা হবেও বা কী করে। আমি দেখতে মোটেই আকর্ষণীয় নই। না আছে চেহারা, না গায়ের রং, না চুলের বৈশিষ্ট্য। লেখাপড়াতেও আমি কোনও জিনিয়াস ধরনের কেউ ছিলাম না। গান গাওয়া, ছবি আঁকা, খেলাধুলা, কোনওটাই নয়। কারিকুলামের বাইরে প্রচুর বই পড়ি বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয়ে, মিথ্যে বলি না, কারুর ক্ষতি করি না, নিন্দা করি না, বাজে আড্ডায় যাই না, সিগারেট খাই না। কিন্তু এ সব আসলে অল্পবয়সি মেয়েদের চোখে পড়ার মতো কোনও গুণ নয় সেটা আমি বুঝতাম। ফলে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ও সহপাঠি কারও কারও সৌভাগ্যে অন্তরে জ্বালা অনুভব করা ছাড়া আর কিছু করার ছিলো না আমার। এমনই ভাগ্য যে যেখানে চাকরি করি সেখানেও কোনও মেয়ে কলিগ নেই। থাকলেও তেমন কী আর হতো? আমি যে লাজুক ও গোটানো স্বভাবের! সেই সব দিনে

চাটগাঁয়ের মেয়েরা অনেক রক্ষণশীলও ছিলো। রাস্তাঘাটে তাদের পরনে আজকালকার মতো সভ্যভব্য পোষাকের বিচ্যুতি তখন চোখেই পড়তো না। অবশ্য তা থাকলেও আমি কি আর সেদিকে তাকিয়ে দেখতাম? যাহোক, ফিরে আসি বাসের ভেতরে।

কতক্ষণ ধরে আড়চোখে লক্ষ করছি সেই অসামান্য সুন্দরী তরুণী মেয়েটি আমার দিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টি ফেরাচ্ছে। একটা মেয়ে দুনিয়ার সেরা সুন্দরীদের একজন বা তাদের অন্যতম হবার জন্য তার চোখ, ভ্রু, নাক, কান, কপাল, ঠোঁট, গলা যেমন হওয়া দরকার মেয়েটির সবকিছু ঠিক তেমনই, নিখুঁত। এহেন এক মেয়ে, আমাকে; ভারি আশ্চর্য!

ব্যাপারটা কয়েকবার হওয়াতে বিষয়টাকে আমার দৃষ্টিভ্রম বলে বাতিল করে দিতেও পারলাম না। সত্যিই মেয়েটি তার মরালের মতো গ্রীবা বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। মুখশ্রী এতোই সুন্দর যে ওকে এক ঝলক দেখে আমার বুকের ভেতর রক্তের একটা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ যেন আমি পষ্ট শুনতে পেলাম। কিন্তু এহেন এক অসাধারণ সুন্দরী কেন ঘন ঘন আমার দিকে তাকাবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমার মনে পড়লো কোনো একদিন আমার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু বলেছিলো, ইমতিয়াজ, তোমার চেহারার সাথে জ্যাক লর্ডের চেহারার একটা মিল আছে। পরে আয়নায় নিজেকে দেখে আমারও তাই মনে হয়েছিলো। আগে কেন মনে হয়নি, ভেবে অবাক হই। টিভি সিরিয়াল হাওয়াই ফাইভ–ও এর নায়ক ছিলো হলিউডের তারকা জ্যাক লর্ড। এই সিরিয়াল নাটক আমিও দেখেছি। অসম্ভব ব্যক্তিত্ববান ও ম্যানলি একটা চরিত্র জ্যাক লর্ডের।

সুন্দরী তরুণীটি কি আমার চেহারাতে সেরকম মিল পেয়েছে? মেয়েটি কি ওই টিভি সিরিজটা দেখেছে? মেয়েরা কি ওসব দ্যাখে? সবাই দ্যাখে না, তবে কেউ কেউ নিশ্চয় দ্যাখে। আমাদের ভার্সিটির পরিচিত মেয়েদের কেউ কেউ তো সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যান, ম্যাকগাইভার, স্টার ট্রেক, এসব দেখে ওগুলো নিয়ে গল্প করতো।

আরেকদিন কোনও এক গল্পে পড়েছিলাম, মেয়েরা কখন কার মধ্যে কী আবিষ্কার করে তা বলা মুশকিল। হয়তো খুব কুৎসিত চেহারার কোনও পুরুষের মধ্যেই তার মনের মানুষটাকে আবিষ্কার করে তারা। এতে মনের মধ্যে একটা গোপন আশা উঁকি দেয় আমার।

এক সময় আমার মনে হলো মেয়েটা আমাকে কিছু একটা বলতে চায়? – আপনার সাথে একটু গল্প করতে পারি? আগাথা কৃষ্টি পড়েছেন? রবার্ট ব্লেক সম্পর্কে বলুনতো, রহস্য গল্প আপনার খুব পছন্দ? – এই সব। আহ, এই সব প্রশ্নের সুন্দর উত্তর আমি দিতে পারবো। জিজ্ঞেস করুক না একবার!

–আপনার হাতে ওটা রহস্য পত্রিকা না? একটু দেখতে পারি?

কিছুটা চুপসে গেলাম আমি। তাও সামলে নিয়ে বললাম, নিশ্চয়, নিশ্চয়। বলে পত্রিকাটা সোৎসাহে এগিয়ে দিলাম। আগ্রহের সাথে পত্রিকাটা নিয়ে সেই যে সোজা হয়ে বসে পত্রিকার পাতা উল্টাতে থাকলো, আর আমার দিকে ফিরে তাকালো না। আমি অবশ্য ভাবলাম এসব প্রেম ভালোবাসাতো এভাবেই শুরু হয়। বই চাওয়া দিয়ে শুরু হওয়াটা সবচাইতে বেশি প্রচলিত। এরপর নিশ্চয় ঠিকানা চাইবে আমার। হয়তো ফোন নাম্বার। সেক্ষেত্রে অফিসের নাম্বার দেওয়া যাবে। (তখনকার দিনে মোবাইল ফোন বলে কিছু ছিলো না।)

পেছন থেকে মেয়েটির রেশমের মতো চুলের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমি কল্পনার জাল বুনে চলেছি। ফিকে গোলাপি রঙের মুখমণ্ডল, পরেছে সেই রঙের কামিজ ও সাথে একই রঙের ফিনফিনে ওড়না। মেয়েটি চিটাগাঙের নয় বেশ বুঝতে পারছি। এতো আঁটসাঁট পোশাকে বাড়তি কিছু, যেমন একটা শালটাল ছাড়া চিটাগাঙের মেয়ে বের হতো না।

এ যদি সত্যি আমার প্রেমে পড়ে গিয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে আমার ভূমিকা কী হবে? সহসাই কি বিয়ের পাট চলে আসবে? আমি কি তার জন্য তৈরি? তৈরি না-এরই বা কী আছে? ভালো চাকরিইতো করি। মেয়েটি নিশ্চয় ঢাকায় থাকে। সেক্ষেত্রে একটু সমস্যা হতে পারে যে সে চাইবে আমিও ঢাকায় থাকি। কিন্তু আমাদের কোম্পানির কোনও অফিসতো ঢাকায় নেই যে ট্রান্সফার নেবার চেষ্টা করবো। ধুশ্‌শ ... এখনই এতো ভাববার কিছু নেই। সে রকম হলে ধীরে সুস্থে ঢাকায় একটা চাকরির চেষ্টা করবো।

মেয়েটা কী করে? চাকরি করে? না পড়ে? নিশ্চয় পড়ে, বয়স তো খুব কম। ছোটো ভাইকে নিয়ে সে একা চিটাগাঙে কোথায় এসেছিলো? এমন সুন্দরী এক মেয়েকে তার বাবা-মা এরকম একা যেতে দেয়! তার মানে এরা খুব উদার এবং শিক্ষিত ও প্রগতিশীল এক পরিবার। আমার এমনই পছন্দ। মেয়েটার বাবা যদি খুব বড়োলোক হয়, তার যদি নিজেরই কোনও কোম্পানি থাকে, আর সেখানে আমাকে ঢুকিয়ে দিতে চায়? না, আমার ব্যক্তিত্বে আমি তা মানবো না। ওরকম প্রস্তাব আমি কিছুতেই গ্রহণ করবো না। আমি বলবো, আমার নিজের সাধ্যে যেমন কুলোয় তেমনটাই আপনাকে মেনে নিতে হবে। এতে নিশ্চয় মেয়েটি (যে কিনা আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে) খুশি হবে। শুনেছি মেয়েরা ব্যক্তিত্ববান পুরুষই পছন্দ করে।

– এই যে আপনার পত্রিকাটা। আমরা সামনেই নেমে যাবো। অনেক ধন্যবাদ।

অ্যাঁ, ঢাকা যাচ্ছে না তাহলে। নামবে ফেনী। সাথের ছেলেটার কথা শুনে আঁতকে উঠলাম। বাইরে এক আইসক্রিমওয়ালা। সেদিকে দেখিয়ে ছেলেটা বললো, আম্মু, আইসক্রিম খাবো।

মা?? ভাই নয়, ছেলে! এতোটুকুন মেয়ে, ছ'সাত বছরের এক ছেলের মা?

ফেনীতে নেমে আমি কিছু খাইনি।

*(নিজের লেখা একটা অতি পুরোনো ছোটো গল্পের কথা মনে করে নতুন করে লেখা – ৩০ এপ্রিল, ২০২৩, টরন্টো।)*

# বর্ষাকাল

পুতুল বাড়ৈ
প্যারামেডিক, হিউম্যান রিসোর্সেস
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

বাংলা সাহিত্যের একটি বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে বর্ষা ঋতু। ঋতুরাজ বসন্ত হলেও বর্ষার রয়েছে এক ভিন্ন আবেদন। বর্ষা নিয়ে রয়েছে প্রচুর রোমান্টিক গান, কবিতা।

আষাঢ় ও শ্রাবণ এ দু'মাস বর্ষাকাল। এ সময় আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা থাকে এবং সারাদিন রিমঝিম বৃষ্টি হয়। নদী-নালা, খাল-বিল পানিতে ভরা থাকে। রাস্তা-ঘাটে জমে অনেক কাঁদা। চারপাশ থেকে আসে পাট পঁচার গন্ধ, তবুও বর্ষার সৌন্দর্য কম নয়।

কতদিন বৃষ্টিতে ভেজা হয় না। স্কুল থেকে ফেরার পথে বৃষ্টি নামলে মানকচুর পাতাকে ছাতা বানিয়ে দলবেঁধে বাড়ি ফেরাও হয়না। বৃষ্টির জলে খোলা আকাশের নিচে স্নান করা হয় না। বৃষ্টি না হলে সোনা ব্যাঙের বিয়ে দেয়া আমরাও দেখেছি। অনেক ছোটোবেলার কথা তবুও মনে আছে। বাংলার লোকসংস্কৃতির অঙ্গ ছিলো এগুলো। ধীরে ধীরে অনেক কিছুই হারিয়ে যাচ্ছে। এখন আর সোনা ব্যাঙের বিয়ে হয় না।

বর্ষাকাল প্রিয় হলেও আমার কাছে একটি মর্মান্তিক স্মরণীয় ঋতু। এই বর্ষাকালে আমার বাবা মৃত্যুবরণ করেন। আমার বাবার মৃতদেহ যখন নৌকায় করে বাড়ি নিয়ে আসা হয় তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। নৌকা বৃষ্টির জলে টই-টম্বুর হয়ে বাবার মৃতদেহ এবং নৌকা ডুবে যাচ্ছিল। অনেক মর্মান্তিক দৃশ্য ছিল এগুলো। পুরো দুই দিন আমরা পরিবারের সবাই কর্দমাক্ত ছিলাম। কারণ বাবার মৃতদেহকে চিতায় দিয়ে দাহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ স্নান করতে পারবো না। তাই আজও আমরা এই বর্ষাকালকে গভীরভাবে স্মরণ করি এবং কিছু লোকজনকে ডেকে ভোজন করিয়ে দেই।

আমার ছোটো দাদাভাইও এই বর্ষাকালে মৃত্যুবরণ করেন। আমার বাবা মৃত্যুবরণ করেন আষাঢ় মাসে আর আমার ছোটো দাদাভাই মৃত্যুবরণ করেন শ্রাবণ মাসে। তাই বর্ষাকাল আমাদের পরিবারের কাছে শোক দিবসের কাল।

বর্ষাকালে প্রকৃতি নতুন জীবন পেয়ে থাকে। বাতাস নির্মল ও শীতল হয়ে যায়। বর্ষার নতুন জলে জলজ প্রাণীরা প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। বৃষ্টির ফলে মাটি

নরম হয়ে যায় এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। জলভরা জমিতে শাপলা-শালুক ফুল ফুটে এই ঋতুকে বিমোহিত করে তোলে।

বর্ষাকাল যে শুধু মানুষের মুখে হাসি ফোটায় তা নয়। খরস্রোতা নদী মাসে মাসে বান ডেকে উপকূলীয় অনেক বসতবাড়ি, ফসল ও গবাদিপশু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পানিবাহিত নানা সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এসময় সাপ, পোকা-মাকড়ের উপদ্রব বেড়ে যায়। তাই মানুষের জীবন চলাচল খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে।

অপূর্ব রূপ নিয়ে বর্ষা আমাদের দেশে আগমন করে। বর্ষাকাল আমাদের যেমন ক্ষয়-ক্ষতি বয়ে আনে তার চেয়ে বেশি উপকার বয়ে আনে। কেননা বর্ষাকালে যদি ঘনঘন বৃষ্টি না হত তাহলে আমাদের এদেশ মরুভূমিতে পরিণত হতো। শুধুমাত্র বর্ষার কারণেই আমাদের এদেশ সবুজ ফসলে অপরূপ সুন্দর। তাই প্রতিবছর আমরা এই বর্ষার আগমনকে স্বাগত জানাই।

# অতীত ফিরে চাই

মো. রফিকুল ইসলাম
ডেপুটি ম্যানেজার, ক্যাড অ্যান্ড প্যাটার্ন
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

পুটুশ পাটুশ শব্দ করে পটকা ফোটায় কে?
আমায় তোরা তোদের সাথে বন্ধু করে নে।
ভালো লাগে না আজকের জীবন অতীত ফিরে চাই
হারিয়ে ফেলা অতীতটাকে কোথায় খুঁজে পাই
ফড়িংগুলো উড়ে উড়ে বসছে ডালে ডালে
ফিঙে পাখি টপাটপ পুরছে তাদের গালে।
হাত নাচিয়ে আমিও তাদের ছুটবো পিছু পিছু
তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ধরে নেবো কিছু।
মায়ের বারণ বাবার শাসন আজকে দেবো ফাঁকি
নাটাই সুতা ঘুড়ি নিয়ে মাঠের পথ হাঁকি।
দল বেঁধে রাখালেরা খাবো মিলে মিশে
সন্ধ্যা হলেই ফিরবো বাড়ি আমরা অবশেষে।

# কালো রংধনু

আরিফ হোসেন
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

*১০ আগস্ট ২০২৩, বৃহস্পতিবার।*
কাল শুক্রবার। সপ্তাহের বাকি ছয় দিন ব্যস্ত থাকার পর ফিরে আসে- বহু কাঙ্ক্ষিত এ দিনটি! এদিন তাই অন্য সকল ব্যস্ততার ছুটি! দিনটি কেবলমাত্র আরাফাত আর রাইদার জন্যই বরাদ্দ রাখেন মোহাম্মদ ইব্রাহিম! আদর করে বড়ো কলিজা ও ছোটো কলিজা বলে ডাকেন ওদের। ইব্রাহিমের দু'নয়নের আলো ওরা। স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে সুখের সংসার মোহাম্মদ ইব্রাহিমের। মিরপুর পাইকপাড়া ছাপাখানার মোড়ের কাছে আইকন একাডেমিতে তার প্রায় নয় বছর বয়েসি ছেলে কেজি আর সাড়ে ছয় বছর বয়েসি মেয়ে নার্সারিতে পড়ে। প্রায় প্রতি শুক্রবারই কোথাও না কোথাও স্ত্রী ও আদরের এই দুই সন্তানসহ একসাথে বাইরে ঘুরতে যাওয়া ও খাওয়া-দাওয়া করার জন্য বরাদ্দ রাখেন মোহাম্মদ ইব্রাহিম। সন্তানেরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকে দিনটির জন্য। প্রথম প্রথম তারা রিকশায় ঘুরতেন, এরপর মোটরসাইকেল কেনেন মোহাম্মদ ইব্রাহিম। কিন্তু মোটরসাইকেলে জায়গা না হওয়ায় তিনি গাড়ি কেনেন, যেন তারা একসাথে ভালোভাবে ঘুরতে পারেন। এভাবেই ওদের সব সময় হাসিখুশি ও ভালো রাখার জন্যই ইব্রাহিমের এতসব আয়োজন ও প্রচেষ্টা!

*১১ আগস্ট ২০২৩, শুক্রবার।*
শুক্রবার দিনটি ইব্রাহিম ও তার পরিবারের জন্য স্পেশাল! পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আজ সারাটিদিন ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে দারুণ সময় কাটে ইব্রাহিমের! দিনশেষে ছোটো দুটি শিশুর উৎফুল্ল হাসিমুখ দেখে একটা নির্মল প্রশান্তি ও আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন ইব্রাহিম। ইব্রাহিমের জীবনের সকল আনন্দও যেন ওদের ঘিরেই! সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে অর্থাৎ শনিবার থেকে ব্যস্ততা শুরু হয় ইব্রাহিমের এবং অপেক্ষা করেন আরো একটি শুক্রবারের!

মানুষের জীবনের সব চাওয়াগুলো সব সময় তার মন মতো হয় না, কখনো কখনো বিধাতা মানুষের নিয়তি লিখেন অন্য কোনোভাবে! মানুষের সাধ্য নেই সেই রহস্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝার! নিজের সাথে যখন এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে তখন মানুষ

কষ্ট পায় আর উল্টোটা ঘটলে আনন্দিত হয়!

*১৪ আগস্ট ২০২৩ সোমবার।*
হঠাৎই ইব্রাহিমের বড়ো কলিজা আরাফাতের হালকা জ্বর আসে।

বিষয়টি জানার পর থেকে ইব্রাহিম সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকলেও তার মনটা পড়ে থাকে ছেলে আরাফাতের কাছেই! ছেলের হঠাৎ জ্বরে কপালে চিন্তার ভাজ পড়ে ইব্রাহিমের! কারণ ইব্রাহিম জানেন, সময়টা এখন ভালো না। ডেঙ্গুর প্রকোপ চারদিকে। সিটি কর্পোরেশন থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় বেশ অপ্রতুল। মশা বাড়ছে দ্রুততার সাথে। মানুষের অসচেতনতাও ডেঙ্গু রোগী বাড়ার একটি অন্যতম প্রধান কারণ। তার উপর আক্রান্ত রোগীর তুলনায় হাসপাতালগুলোতে শয্যা অনেক কম থাকায় লোকজন পর্যাপ্ত চিকিৎসাও পাচ্ছেন না। এমন নানাবিধ সমস্যার কারণে ঢাকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ ক্রমেই বাড়ছে। একটা অজানা আশঙ্কায় ইব্রাহিমের বুকের ধড়ফড়ানি বাড়ে। সারাদিন ফোনে খবর নেন ছেলের এবং দেরি না করে পরদিনই অর্থাৎ ১৫ আগস্ট এলাকার এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান তার বড়ো কলিজা আরাফাতকে। জ্বরের জন্য কিছু মেডিসিন ও ডেঙ্গু পরীক্ষার পরামর্শ দেন চিকিৎসক এবং ভয়ের কোনো কারণ নেই বলে জানান। চিকিৎসকের আশ্বাসে কিছুটা নিশ্চিত হন ইব্রাহিম।

*১৬ আগস্ট ২০২৩।*
রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টে আরাফাতের ডেঙ্গু পজিটিভ আসে। খবরটি শুনে যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে ইব্রাহিমের! তবে প্লেইটলেট ভালো থাকায় চিকিৎসক বলেছিলেন আরাফাতকে হাসপাতালে নেয়ার দরকার নেই। চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক বাসায় বিশ্রামে রেখে চিহিকৎসা চলে ছেলে আরাফাতের। ছেলের অসুস্থতার কারণে ১৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ইব্রাহিম অসুস্থ ছেলের পাশে সারাদিন সময় কাটান। অসুস্থ ছেলে আরাফাত ইব্রাহিমকে বলে,
-বাবা, তোমার কি মনে আছে? আমি কিন্তু সামনের জন্মদিনে প্লেনে করে সিলেটে আমার জন্মদিন পালন করবো আর আগামীকাল শুক্রবারে আমরা কিন্তু ঘুরতে যাবো।
ইব্রাহিম ছেলেকে সান্ত্বনা দেন,

- হ্যাঁ বাবা, তুমি আগে সুস্থ হও। তুমি সুস্থ হলে আমরা নিশ্চয়ই সিলেটে যাবো এবং কাল ঘুরতে যাবো।

সম্ভবত এটাই ছেলের সাথে ইব্রাহিমের শেষ কথোপকথন। এরপর থেকেই আরাফাত কেমন যেন চুপচাপ হয়ে যায়, আর কোনো কথা বলে না!

*১৮ আগস্ট ২০২৩, শুক্রবার।*

শুক্রবার দিনটি ইব্রাহিমের জন্য খুব স্পেশাল ও আনন্দের! এদিন তার সকল পরিকল্পনা থাকে- স্ত্রী ও সন্তানকে ঘিরেই! আজ খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে যায় ইব্রাহিমের। পাশে তাকিয়ে দেখে ছেলেটা নিশ্চিন্ত মনে তখনো ঘুমাচ্ছে। ছেলেটার মুখের দিকে তাকালে একটা অদ্ভুত মায়া অনুভব করে ইব্রাহিম। তা সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না। হয়তোবা সব বাবা এমনটাই অনুভব করেন! দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ান ইব্রাহিম। আকাশটা কালো মেঘে ঢাকা। সকালে আকাশের এমন মন খারাপের কারণ ঠিক বুঝতে পারে না ইব্রাহিম। সকালে সাধারণত এমনটা খুব কমই থাকে। হালকা শীতল ও দমকা হাওয়াও বইছে। ঘরে ছেলে অসুস্থ, বাইরে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া! আজকের দিনটি কেমন যেন এলোমেলো লাগছে ইব্রাহিমের! গতকাল রাতেও বৃষ্টি হয়েছিলো। সময়টা এখন বর্ষাকাল না, যে ঝড়-বৃষ্টি হতে হবে! প্রকৃতির হঠাৎ এমন আচরণ অদ্ভুত লাগছে ইব্রাহিমের! যদিও আমরা বিভিন্নভাবে প্রকৃতির বারোটা বাজিয়েছি নিজেরাই, তার কিছুটা ফলাফল তো আমাদেরই ভোগ করতে হবে! আজকের আবহাওয়াটা মোটেও ভালো না, মনে মনে ভাবে ইব্রাহিম। আকাশটা এমনভাবে কালো হয়ে আছে যেন সে কারো ওপর ভীষণ রাগ করেছে। যেকোনো সময় আকাশের বুক থেকে কান্না হয়ে বৃষ্টি ঝরবে। মনে মনে ভাবে ইব্রাহিম, ছেলেটা বলেছিলো আজ ঘুরতে যাবে। সুস্থ হলে আগামী শুক্রবার সবাই মিলে দূরে কোথাও ঘুরতে যেতে হবে। অনেক বেলা হয়ে আসে কিন্তু ছেলের ঘুম তবু ভাঙে না। ডাকাডাকি করার পরও যখন কোনো কথা বলে না, তখন চিন্তিত ইব্রাহিম হাসপাতালে নিয়ে ছেলের রক্ত পরীক্ষা করায়। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট পেলে জানতে পারেন, আরাফাতের রক্তের প্লেইটলেট অনেক কম এবং তার প্লেইটলেট কমার লক্ষণও সুস্পষ্ট। হঠাৎ এমন অনাকাঙ্ক্ষিত রিপোর্টে ইব্রাহিমের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। নানাবিধ আশঙ্কা এসে জড়ো হয় মনে। বাইরে তখন ঝুম বৃষ্টি শুরু হয়, ক্ষণে ক্ষণেই বজ্রপাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আরাফাতের রক্তের প্লেইটলেট কমার এ সংবাদে যেন প্রকৃতিও মনের দুঃখে কান্না করছে! ছেলে তখনো চুপচাপ বিছানায় শুয়ে আছে। ঘটনার আকস্মিকতায় ইব্রাহিম ঠিক কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান কিছুক্ষণের জন্য। ছেলের সুস্থতার জন্য সৃষ্টিকর্তার নিকট মনে মনে প্রার্থনা করতে থাকেন ইব্রাহিম। কিন্তু ছেলে কোনো কথা না বলায় আতঙ্কিত ও দিশেহারা ইব্রাহিম

বৃষ্টির মধ্যেই ছেলেকে নিয়ে পাগলের মতো ছুটে চলেন হাসপাতালে।

পথে ছেলের সাথে অনেক কথা বলার চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু ছেলে কোনো কথাই বলে না। স্থানীয় ডেলটা হাসপাতালে নেয়ার পর জরুরি বিভাগের চিকিৎসক পরীক্ষা করে জানান যে, আরাফাত মারা গেছে। চিকিৎসক বিষয়টি যতটা সহজভাবে বলেন, ইব্রাহিম ঠিক ততটাই চরম অবিশ্বাস নিয়ে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন চিকিৎসক ও ছেলের দিকে! সবকিছু এত দ্রুত ও চোখের পলকে ঘটেছে যে, ইব্রাহিমের বুকফাটা কান্না, হাহাকার ও আর্তনাদও যেন কিছু সময়ের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে যায়! এরপর কেবলই কান্না, হাহাকার আর আর্তচিৎকার! নিথর ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ঐদিন স্ত্রী ও তার গগনবিদারী কান্না দেখে আশেপাশের এমন কেউ ছিলো না যে, তাদের চোখেও জল আসেনি। সন্তান হারানো বাবা-মাকে কীভাবে সান্ত্বনা দিবে আশেপাশের লোকজন! তবু ছলছল চোখে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন কেউ কেউ।

সাভারের হেমায়েতপুরে ছেলেকে চিরনিদ্রায় শায়িত করেন ইব্রাহিম। বাবার কাঁধে ছেলের লাশ- বিষয়টি যে কত ভারী ও কষ্টের কাজ, তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউই জানে না। একটু ঠান্ডা লাগবে বলে কখনো যে ছেলেকে খালি পায়ে মাটিতে দাঁড়াতে দেননি ইব্রাহিম, আজ তাকে মাটির কবরে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়েছে। ইব্রাহিমের চোখের জল ঝরতে ঝরতে মনে হয় একদম শুকিয়ে গেছে। এখন আর চোখ থেকে জল ঝরে না, তবে বুকের ভিতরটায় যেন শূন্যতা ভর করেছে! এখনো ইব্রাহিমের প্রায়ই মনে হয়, তার আরাফাত মারা যায়নি। বাড়ি গিয়ে দেখবেন যে, ছেলে বাসায় তার জন্য অপেক্ষা করছে। ছেলে মারা গেছে, এখনো তার এটা বিশ্বাসই হচ্ছে না। বাবার মন বলে কথা!

ছেলে হারানোর দুঃখ যখন প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল অসহায় বাবা-মাকে ঠিক তখনি মরার ওপর খাড়ার ঘায়ের মতো আরো একটি দুঃসংবাদ পায় তারা। মেয়ে রাইদাও ডেঙ্গু পজিটিভ! মেয়ের হালকা জ্বর দেখে ডেঙ্গু টেস্ট করানো হয়। একদিকে পুরো হৃদয় জুড়ে ছেলে হারানোর দগদগে তাজা ক্ষত, ছেলে হারানোর শোকে কাতর ইব্রাহিম তার ছোটো কলিজার জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে সর্বোচ্চ চিকিৎসা নিশ্চিতকল্পে সব রকম ব্যবস্থা নেয়ার সংকল্প করে। কিন্তু হাসপাতালে শয্যা খালি না থাকা, শিশুদের পিআইসিইউতে সিট না থাকা, পাগলের মতো অনেক জায়গায় ঘুরে মেয়েকে ভর্তি করেন ধানমন্ডির একটি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা চলে তার, অনেক টাকাও খরচ করেন ইব্রাহিম। প্রয়োজনে নিজের কিডনি দুটো বিক্রি করে হলেও তিনি মেয়ের চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হতে দিবেন

না। মনে মনে সৃষ্টিকর্তার নিকট কত যে প্রার্থনা করেছেন তার কোনো হিসেব নেই। কিন্তু মেয়েটারও প্লেইটলেট কমে আবার বাড়ে। স্থির থাকে না। নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়ে ইব্রাহিম ও তার স্ত্রী পাগলের মতো মেয়ের সুস্থতা কামনা করেন। ছেলে হারানোর স্মৃতি এখনো এক সপ্তাহের পুরনো হয়নি, এখনো ছেলের জন্য বাবা-মায়ের দুচোখ থেকে কান্নার জলের দাগ মুছেনি।

*২৫ আগস্ট শুক্রবার।*

মেয়ে আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে। পাগলের মতো হাউমাউ করে কান্না শুরু করেন ইব্রাহিম। তাকে কেউ কীভাবে সান্ত্বনা দিবেন, গত সপ্তাহে ছেলেকে হারিয়েছেন চিরতরে! এখন মেয়ের অবস্থাও ভালো না। এক চরম অনিশ্চয়তাকে ঘিরে হাসপাতালে অপেক্ষা করতে থাকে ইব্রাহিম। চিকিৎসক সবাইকে অবাক করে দিয়ে জানান ইব্রাহিমের মেয়ে রাইদা মারা গেছে। এটা শুনে ইব্রাহিমের স্ত্রী একদম চুপচাপ ও শান্ত হয়ে যান। মেয়েকে নিয়ে আসলে তাকে জড়িয়ে ধরেন কিন্তু কোনো কান্না করেন না। অধিক শোকে তিনি হয়তোবা পাথর হয়ে গেছেন! ইব্রাহিম আহাজারি করতে থাকেন, সৃষ্টিকর্তা তাকে না নিয়ে কেন তার দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে গেলেন। তার জীবনের বিনিময়ে তিনি তার দুই ছেলেমেয়েকে ফেরত চান। তাদের কান্নায় আশেপাশের পরিবেশ ভারী হয়ে আসে। সবারই চোখে অশ্রু ঝরে! শেষ পর্যন্ত তার মেয়েটাকেও বাঁচানো গেল না। কাকতালীয় ব্যাপার হলো মেয়েটিও মারা গেল ছেলেটি মারা যাওয়ার ঠিক পরের সপ্তাহের শুক্রবারেই! ছেলে ১৮ আগস্ট আর মেয়ে ২৫ আগস্ট। তার দুটি পাখিই চলে গেল না ফেরার দেশে!

মেয়েকে কবরে শুইয়ে দিয়ে বাসায় ফেরেন ইব্রাহিম ও তার স্ত্রী। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে ওদের দুজনকে হারিয়ে ইব্রাহিমের জীবনটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। ডেঙ্গু হওয়ার আগে মেয়েটা বলতো, 'বাবা, ঢাকায় থাকবো না। এখানে অনেক মশা।' ইব্রাহিম বুঝতে পারেনি 'মশা' নামক ছোট্ট প্রাণীটি তার দুই নয়নের আলো নিভিয়ে দিবে চিরতরে।

সাভারের হেমায়েতপুরে ছেলে-মেয়ের জন্য কেনা জায়গাটাতে ইব্রাহিম ভেবেছিলেন বাড়ি তৈরি করবেন। ছেলের জন্য নীল রঙের রুম ও মেয়ের জন্য গোলাপি রঙের রুম বানাবেন, সে সুযোগ সৃষ্টিকর্তা তাকে দিলেন না! ভাই-বোন দুজন দুজনকে অনেক ভালোবাসতো। বিভিন্ন কারণে মায়ের বকুনি থেকে ভাই বা বোনকে বাঁচানোর জন্য ওরা দুজন একজোট হতো। আজ তারা মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে সেই হেমায়েতপুরেই পাশাপাশি কবরে শায়িত চিরতরে। সারাদিন হৈ-হুল্লোড় আর নানারকম দুষ্টুমিতে পুরো ঘরটা মাতিয়ে রাখতো দুজন, আজ সেই বাড়িতে সুনসান নিরবতা! দুই ভাইবোন প্রতি সপ্তাহে যে শুক্রবারের অপেক্ষায়

থাকতো, নিয়তি এক সপ্তাহের ব্যবধানে তাদের সেই শুক্রবারেই চিরতরে নিয়ে গেছে- না ফেরার দেশে। হঠাৎ ইব্রাহিমের নজর পড়ে অ্যাকুরিয়ামের দিকে! সেখানে দুটো মরা মাছ ভাসছে। আরাফাত ও রাইদা মাছদুটো নিয়ে খেলতো। গতকালও মাছ দুটো বেঁচে ছিলো। মাছগুলোর চোখের সামনে থেকে ছেলে ও মেয়েটা না ফেরার দেশে হারিয়ে যাওয়ায় সে শোক সইতে না পেরে হয়তোবা মাছগুলোও মারা গেছে!

ইব্রাহিমের স্ত্রী কোনো কথা বলছে না, বিষয়টি নিয়ে খুবই চিন্তিত তিনি। অধিক শোকে যেন পাথর হয়ে গেছে। মোবাইলে ছেলে মেয়ের ছবি দেখে ও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

বাইরে বজ্রপাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে, হঠাৎ আবার বৃষ্টি শুরু হয়। ইব্রাহিমের মনের আকাশও কালো মেঘে ঢাকা। আজীবন সে মেঘ থেকে চুপিসারে বৃষ্টি ঝরে তাকে ভিজিয়ে দিয়ে যাবে, দুঃখের স্মৃতিরা বারবার ফিরে আসবে তার কাছে চুপিচুপি। এ কষ্ট কেবলই ইব্রাহিমের! এ কষ্ট এক অসহায় পিতার! বৃষ্টি শেষে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। বাঁকানো রংধনুর অদ্ভুত রঙিন সাজ ছড়িয়ে পড়ে আকাশজুড়ে। কিন্তু ইব্রাহিমের জীবনটা যেন অন্ধকারের কালো রঙে ডুবে রয়েছে। তার জীবনে এখন আর অন্য কোনো রঙের অস্তিত্বই যেন নেই! আকাশের সাতরঙা রংধনুর প্রত্যেকটা রঙ তার কাছে কালো মনে হচ্ছে। তার জীবনটা যেন একটা কালো রংধনুর মতো!

# ভালোবাসা

মো. মজনু মিয়া
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, কর্পোরেট ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স
অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

ভালোবাসা কী খাঁচায় বন্দি পাখি?
নাকি বাঁচার আকুতি জড়ানো অশ্রুসিক্ত আঁখি?
না, তবে?
ভালোবাসা উন্মুক্ত হাওয়া আর উড়ন্ত পাখির ডানা,
ভালোবাসা না লেখা কবিতা আর ফেরারি কবির অজানা ঠিকানা।
ভালোবাসা খোলা চিঠি, এলোমেলো বাতাসে ওড়ানো শাড়ির আঁচল।
ভালোবাসা কপালের কালো টিপ আর চোখের ঘন কাজল।
ভালোবাসা হাত ভর্তি রেশমি কাচের চুড়ি,
ভালোবাসা শিশিরে ভেজা ঘাসে আলতা পরা পায়ের ছাপের ছড়াছড়ি,
হয়তো এসব কিছুই সত্যি নয়।
যা বলেছি হয়তো তাতে ভালোবাসা নেই!
তবে?
ভালোবাসা চোখের কাজলে নয়,
বরং কাজলে রাঙানো দুটি চোখের মায়ায়।
ভালোবাসা রেশমি কাচের চুড়িতে নয়,
বরং চুড়িতে সাজানো হাতের দুটি ছোঁয়ায়।

# শৈশবের গান

শেখ মৃন্ময় জামান
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
অবনী টেক্সটাইলস লিমিটেড

## এক

গোলকিপারকে পরাস্ত করে অবশেষে বলটি যখন প্রতিপক্ষের জালে প্রবেশ করলো তখন খেলার আর মাত্র এক মিনিট বাকি। শেষ বাঁশি বাজার সাথে সাথেই খেলার একমাত্র গোলদাতা জহিরকে নিয়ে শুরু হলো আমাদের জয়োৎসব। নব্বই দশকের শেষের দিককার কথা বলছিলাম। সেইবার জহিরের কারণেই আমরা স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল পর্যন্ত যেতে পেরেছিলাম। শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও টুর্নামেন্টের সেরা গোলদাতা হয়েছিল আমাদের বন্ধু সপ্তম শ্রেণির ছাত্র জহির। কিন্তু পরের ক্লাসে উঠার সাথে সাথেই সে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সম্ভবত পারিবারিক কারণে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল। শৈশবে হারিয়ে ফেলা বন্ধুদের মধ্যে ওর কথাই ঘুরেফিরে বেশি মনে পড়ে। সেই সময় কোনো বন্ধু এলাকা থেকে দূরে চলে গেলে কেন যেন তার সাথে আর যোগাযোগ করার সুযোগ থাকতো না। এভাবেই আমরা আমাদের কিছু প্রিয় বন্ধুদের হারিয়ে ফেলতাম। একথা এখন চিন্তা করলেই মনটা কেমন যেন হয়ে যায়।

জহির আমার স্কুল জীবনের অন্যতম প্রিয় বন্ধু ছিল। পঞ্চম শ্রেণিতে সে আমাদের স্কুলে এসে ভর্তি হয়। হালকা পাতলা গড়নের নিতান্তই সহজ সরল একটা ছেলে। এক কথা দুই কথায় জানা গেল খেলাধুলা নিয়ে তার প্রবল আগ্রহের কথা। আমরা ফুটবল খেলি শুনে সেও আমাদের সাথে খেলার আগ্রহ প্রকাশ করলো। তাকে আমাদের সাথে মাঠে খেলতে আসতে বললেও শুরুতে খুব একটা পাত্তা দেইনি। কিন্তু মাঠে তার খেলা দেখে চোখ রীতিমতো চড়কগাছে উঠে গেল। সে ছিল অসাধারণ সেন্টার ফরওয়ার্ড। ওর পায়ে বল গেলে গোলকিপারের জন্য তাকে মোকাবিলা করা বেশ কঠিন ছিল। খেলা নিয়ে শুরুর দিকে আমাদের দুইজনের একটু আধটু ঝামেলা হলেও একসময় সে আমার অন্যতম প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠলো। তখন আমরা এলাকার বন্ধুরা এলাকার সমবয়সি কিছু ছেলেদের নিয়ে বিকেলে নিজেদের মতো নিয়মিত খেলাধুলা করতাম। ইতোমধ্যে জহির ভাল খেলোয়াড় হিসেবে স্কুলে বেশ পরিচিতি পেয়ে গেছে। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করলাম আন্তঃস্কুল ফুটবল টুর্নামেন্টে।

টান টান উত্তেজনাপূর্ন সেই টুর্নামেন্টে শীর্ষ পয়েন্ট নিয়ে দশম শ্রেণি সর্ব প্রথম ফাইনালে পৌঁছে যায়। পয়েন্ট সমান হওয়ায় নবম শ্রেণির সাথে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটি ছিল বাঁচা মরার লড়াই। যে জিতবে সেই পৌঁছে যাবে ফাইনালে এমন একটা দমবন্ধ করা অবস্থা।

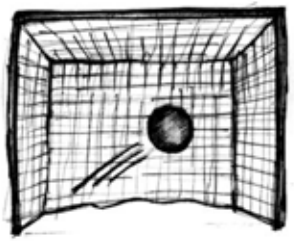

প্রচুর প্র্যাকটিস করার পর আমরা মাঠে নামলাম অঘোষিত সেই সেমিফাইনালের উদ্দেশে। নবম শ্রেণি বেশ কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল। প্রথমার্ধে তারা বেশ ভাল খেললেও আমাদের গোলকিপার মাসুম তাদের একাধিক নিশ্চিত গোল রুখে দিল। প্রথমার্ধের নিস্প্রভ জহির দ্বিতীয়ার্ধে যেন তার ছন্দ ফিরে পেল। জহিরের মুহুর্মুহু আক্রমণে গোলের সম্ভাবনা উঁকি দিল। প্রতিপক্ষের গোলকিপারও বেশ শক্তিশালী থাকায় অনেক আক্রমণ প্রতিহত করলো। খুব হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছিল, অবশেষে গোলের দেখা পেল জহির। খেলা শেষ হওয়ার মাত্র ১ মিনিট আগে প্রতিপক্ষের তিনজন প্লেয়ারকে কাটিয়ে গোলকিপারকে পরাস্ত করে অবশেষে বল প্রবেশ করাল প্রতিপক্ষের জালে। কিছু বুঝে উঠার আগেই মুহূর্তের ভিতরে যেন সবকিছু ঘটে গেল। আনন্দে আমরা সকলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম জহিরের উপরে। কয়েক সেকেন্ড পরেই শেষ বাঁশি বেজে উঠলো। স্মৃতির পাতায় লেখা হয়ে গেল শৈশবের এক অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত।

## দুই

আজ রবিবার। ৬ষ্ঠ আগস্ট, ২০২৩। ফেসবুকে খেয়াল করলাম আজকে বিশ্ব বন্ধু দিবস। এক বন্ধু দেখলাম ফেসবুকে সংগীতশিল্পী সায়ানের একটা গান শেয়ার করেছে। গানটা আমারও খুব পছন্দের। আজকে আবার শুনছি:

‘কেন বাড়লে বয়স ছোট্ট বেলার বন্ধু হারিয়ে যায়,
কেন হারাচ্ছে সব, বাড়াচ্ছে ভিড় হারানোর তালিকায়’

বিভিন্ন দিবস নিয়ে দেখি অনেকেই অনেক সমালোচনা করে। কিন্তু আমি বিষয়টিকে খুব পজিটিভ ভাবেই দেখি। যেমন, বন্ধু দিবস আসলেই অনেকে ফেসবুকে বন্ধুদের নিয়ে স্মৃতিচারণ করে অথবা কোন গান বা ছবি শেয়ার করে। বিষয়গুলো আমাদের খুব নস্টালজিক করে দেয়। একটি ‘বিশেষ দিন’ যদি আমাদের বিশেষ কোন স্মৃতি বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয় তাহলে ক্ষতি কি?

জীবনের অনেক বন্ধুর ভিড়ে শৈশবের স্কুল বন্ধুদের কথাই বেশি মনে পড়ে। শৈশবের যেসব বন্ধুরা সৌভাগ্যক্রমে

এখনো আশেপাশে আছে তাদের সাথে এখনো থেমে থেমে চলে ছুটির দিনের আড্ডা। মনে মনে খুঁজে ফিরি শৈশবের হারিয়ে ফেলা সেইসব দিনগুলি।

আনন্দের কথা হচ্ছে ফেসবুকের কল্যাণে শৈশবের বেশ কিছু বন্ধুকে খুঁজে পাওয়া গেছে। এভাবে একদিন হয়তো জহিরকেও পেয়ে যাবো।

## তিন

স্কুলের মাঠের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ছেলেদের ফুটবল খেলা দেখে দাঁড়িয়ে গেল এক যুবক। তার মনে পড়ে গেল শৈশবের সেই দুরন্ত দিনগুলোর কথা।

ভাবতে ভাবতেই ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে চললো সে...

# সফরের সেরা সফর আমার হজ্জ সফর

মুহাম্মদ সাইফুল হক
প্রাক্তন এজিএম, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

১০ই জুন যখন আমি হজ্জ সফর নিয়ে লিখতে বসলাম তখন হঠাৎ করেই আমার সফর জীবনের ভীষণ কঠিন এক ঘটনার কথা মনে পড়ল। আট বছর আগে ঠিক এইদিনে আমি সাংহাইতে ছিলাম। ফ্লাইট ডিলের কারণে সাংহাইতে আসতে আমার অনেক রাত হয়েছিল। কিন্ত অতরাতে আমার হাতে যথেষ্ট আরএমবি না থাকায় হোটেল এডভান্স দিতে আমার কিছু ডলার চেইঞ্জের দরকার ছিলো। এর সন্ধানে গিয়ে আমি একটি প্রতারক চক্রের হাতে পড়ে কয়েকশ ডলার খুইয়েছিলাম। আজও সেই ঘটনা একটি ভয়াবহ স্মৃতি হিসেবে আমার মনে গেঁথে আছে। এমনি নানা ভোগান্তি যেন সফরের একটি সাধারণ বিষয়। আল্লাহর অশেষ রহমতে খুব ঘন যাতায়াত না হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, যেমন- আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা, চায়না, ভারত, হংকং, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ইত্যাদিতে গিয়েছি। সেই হিসেবে আমার মনে সফর জীবনের নানা সুখস্মৃতি আজও অম্লান। তবে করোনার আগে ২০১৯ সালে এবং করোনার পরে ২০২৩ সালে সৌদিআরব ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে যাওয়া হয়নি। কাজেই শেষের দুইটি ভ্রমণ নিয়ে আমার আজকের পর্যবেক্ষণ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যখন গিয়েছি তা ছিলো কর্মরত প্রতিষ্ঠান বা ক্যারিয়ারের স্বার্থে কিংবা পরিবার নিয়ে ভ্রমণের আনন্দ উদযাপনে কিন্তু সৌদি আরবের সফর এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর ধরণ ভিন্ন, উদ্দেশ্য ভিন্ন, আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন এবং প্রস্তুতিও ভিন্ন। অন্য সফরগুলো সম্পূর্ণরূপে জীবিকার কারণে বা অবসর যাপনে আর সৌদি আরব সফর আত্মসংশোধনে, জীবনের চূড়ান্ত সফলতার জন্য। অন্য সফরগুলোতে সময় কাটতো কোন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের সাথে মিটিং-এ বা স্পট পরিদর্শনে আর এই সফর সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরাব্বুল আলামিনের অনুগ্রহ অন্বেষণে।

২০১৯ সালের আকস্মিক ওমরাহ সফরের মধ্যে জীবনের চাকার চলায় কিছুটা মূল্য সংযোজিত হয়। আর তাতেই করোনার কঠিন সময়টা যেন নিরুদ্বেগ কেটে যায়। উপলব্ধি হয় নতুন বোধের আর তাতে যোগ হয় সাহস, জীবনাচরণ পাল্টে যেতে থাকে, পরিবর্তন হয় ভিতরে ও বাইরে। আজ চার বছর পর হজ্জের উদ্দেশে মক্কায় এসে জীবনকে নতুন আঙ্গিকে দেখার প্রয়াস পাচ্ছি। এবারের আসাটা পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়েই হয়েছে। সময় ও

অর্থের সংস্থানের সাথে সাথে মনের দৃঢ়তা ছিল যথেষ্ট সংহত। স্ত্রীকে সাথে নিয়েই আসার পরিকল্পনা ছিলো কিন্তু তিনি আকস্মিক অসুস্থ হওয়ায় ও একটি অপারেশনের কারণে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। কিন্তু আমার হজ্জে আসার পরিবর্তনে মন সায় দিলো না। কর্তৃপক্ষ আমার ছুটির আবেদন মঞ্জুর করলে শুরু হলো সামগ্রিক প্রস্তুতি। হজ্জ ট্রেনিং-এ আমি অন্তত তিনজন বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ নিয়েছি। এ যেন সফলতার পূর্ণ নিশ্চয়তার অব্যর্থ প্রয়াস।

হাজিসাহেবরা আসেন সারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হতে, তারা দেখতে ভিন্ন, তাদের পোশাক ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন, আচরণ ভিন্ন, খাদ্যাভ্যাসও ভিন্ন কিন্তু এদের প্রত্যেকের বিশ্বাস অভিন্ন। তারা মুসলিম, এক আল্লাহতে বিশ্বাসী তাদের নেতা ও নবী অভিন্ন, আদর্শ অভিন্ন -প্রত্যেকেই খতমে নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসারী। কেবল একটি বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সারা বিশ্বের মানুষ একসাথে চলে, আল্লাহর কথা বলে এবং সৌহার্দ ও সম্প্রীতির যে প্রকাশ ঘটায় তা সত্যি অবর্ণনীয়। আরবি ভাষা না জেনেও বাংলা, ইংলিশ, চাইনিজ ও হিন্দির সামান্য জ্ঞান দিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষের সাথে পরিচিত হওয়া ও ভাব বিনিময় করা সত্যি এক অনন্য ঘটনা। ত্রিশ লক্ষ বা তারও বেশি সংখ্যক মানুষের তিন থেকে ছয়/সাত সপ্তাহ পর্যন্ত বসবাস ও খানাদানা ব্যবস্থাপনা সৌদি সরকারের জন্য এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। এত মানুষের চলাচল, জীবন-যাপন, বাজার-সদাই, নির্বিঘ্ন মেলামেশার ব্যবস্থাপনা স্বয়ং আল্লাহর করুণা ছাড়া অসম্ভব। ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, চায়না, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, মরক্কো, ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং পৃথিবীর সকল দেশ থেকে আগত মানুষের এই মিলনকেন্দ্র সারাক্ষণই জাঁকজমকপূর্ণ। আকারে, বর্ণে, পোশাকে-আশাকে, চলনে-বলনে ও আচরণে ভীষণ ভিন্নতা থাকলেও প্রতিটি মানুষই ভাগ্যবান বা জান্নাতি বললেও অত্যুক্তি হবে না। নানা ভিন্নতার মাঝেও অভিন্নতা কেবল হাসিতে, কাশিতে সেজদায় ও কান্নায়। ঠান্ডা-কাশি, শরীর ব্যাথা, পা ব্যাথা খুব সাধারণ ঘটনা হলেও মানুষগুলোর মাঝে নেই কোন বিরক্তি বা অস্বস্তি বরং তাদের মুখমণ্ডল জুড়ে যেন প্রশান্তি এবং আল্লাহকে প্রাণ ভরে ডাকার আকুতি। বাড়ির আরামদায়ক বিছানা, মুখরোচক খাওয়া ও আপনজনের কোমল পরশ উপেক্ষা করে মানুষগুলো ছুটে চলে কেবল মহান

আল্লাহ তায়ালার করুণা ও ক্ষমা অন্বেষণে। দিনে দিনে সপ্তাহ হয়, সপ্তাহ গড়িয়ে মাস তারপর হঠাৎ মনে হয় চোখের পলকে যেন শেষ হয়ে গেলো হজ্জের দিনগুলো। এই বিশাল জনস্রোতে ত্রিশ বছরের যুবক বা আশি বছরের বুড়ো, পুরুষ কিংবা নারী, সাদা কিংবা কালো, সবল কিংবা দুর্বল, সুস্থ বা পঙ্গু সবারই চোখে যেন একই আকুতি। হে মাওলা সৃষ্টিকর্তা সুমহান- কৃপা করো আমায়, দান করো তোমার অমূল্য দান, দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা এবং সম্মান। আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ তাওয়াফ আর মদিনায় আল্লাহর নবী হুজুরে পাক (সাঃ) এর রওজা জিয়ারতে চলে ক্রমাগত মানুষের ঢল। রওয়াজুল জান্নাহ বা জান্নাতের বাগানে ঢুকে দোয়া করার জন্য চলে দীর্ঘ প্রতীক্ষা। এসবই আল্লাহর প্রতি মানুষের আনুগত্যের এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। ঘুম থেকে জেগে, চরম রোদে, অসমতল মাঠে পায়ে হেঁটে ছুটে চলা মানুষের চিৎকার- হে প্রভু আমি হাজির, তুমি এক অদ্বিতীয়, তুমি সুমহান, সমস্ত প্রশংসা কেবল তোমারই, তুমি সমস্ত দুনিয়ার অধিপতি- নাই তোমার কোন শরিক। এমন দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও অবর্তমান। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের মিলন কেন্দ্রে বর্ণ ভাষা সামাজিক মর্যাদা বিত্ত নির্বিশেষে অল্প দিনেই যে সম্পর্ক ও ভালোবাসার সৃষ্টি হয় তা সত্যিই অতুলনীয়। একজনের কষ্টে অন্যের বেদনা ও অদেখায় যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা হজ্জ ছাড়া আর কোথাও হয় কিনা আমার জানা নেই। সরকারি আমলা, ডাক্তার, প্রকৌশলি, সিইও বা সিওও, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, কৃষক, কর্মচারি অবসর প্রাপ্ত এমনি নানা ধরনের পেশা ও সামাজিক মর্যাদার মানুষগুলোর মাসাধিক কাল অবস্থানে যে সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয় তা বলবৎ রাখা জ্ঞানী মুয়াল্লেমদের জন্য কঠিন হতো যদি না প্রত্যেকের মনে আল্লাহর ভীতি জাগরুক থাকত। জীবনে প্রতিটি বিদেশ সফরের প্রথম সপ্তাহটা আনন্দে কাটলেও পরের সপ্তাহ থেকে শুরু হয় দেশ ও পরিবারের জন্য আকুলতা। কিন্তু হজ্জের সফরে সপ্তাহের পর মাস গড়িয়ে গেলেও তৈরি হয় না কোন বিষণ্নতা। বরং যেনো দেশে ফেরার সময় এলেও মনে হয় আরো কটা দিন যদি থাকা যেত। তাই এ সফর জীবনের শ্রেষ্ঠ সফর। বাইতুল্লাহ আর সোনার মদিনায় নিয়মিত সালাত আদায় ছাড়াও কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান দর্শনে মনের মধ্যে পরম আবেগে উথাল-পাথাল হয়েছে। যোগ্য আলেমের সুললিত কণ্ঠে সুমধুর বয়ান ও মোনাজাতে যাত্রাপথ স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

আমার সফরের প্রথম আটদিন কাটে সোনার মদিনায় যা শুরু হয় মহানবী (সাঃ) এর রওজা মোবারক জিয়ারতের মধ্য দিয়ে। এরপর আটদিনের বিশেষ ঘটনার মধ্যে রয়েছে মসজিদে কুবা, মসজিদে কেবলাতুন, খন্দক ও ওহুদের বিশেষ ঐতিহাসিক স্পট পরিদর্শন। মদিনায় সবচেয়ে সুখকরস্মৃতি ছিলো রওয়াজুল জান্নাতে ঘণ্টাধিক সময়ের অবস্থান ও মাগরিবের জামাত আদায়। এছাড়া জান্নাতুল বাকিতে জিয়ারত মনে

বিশেষ ভাবাবেগের জন্ম দিয়েছে। আর মক্কা তো আমার কাছে সাগরতুল্য মনে হয়েছে, লোকে লোকারণ্য। প্রতিটি আমল যেন জীবন্ত- তাওয়াফ, সা-ই, কুরআন পাঠ, জিকির, নামাজ, মোনাজাত, জমজমের পানি পান- সব সময়ে চলমান। খাবারের দোকান, পণ্য বিক্রির মার্কেট, রাস্তাঘাট সবই লোকে লোকারণ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসা মানুষগুলো হোটেল থেকে দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে বাইতুল্লাহ আসে। নিরাপত্তা কর্মীরা মাঝে মাঝে গেইট বন্ধ করে দেয় অতিরিক্ত লোকের চাপে। তখন আল্লাহর মার্জনা কামনাকারী মানুষেরা আরো দূর ঘুরে বাইতুল্লায় তার কাঙ্ক্ষিত স্থানে গমন করে। তাদের নেই ক্লান্তি, নেই কষ্টের কোন পরোয়া।

পথে হঠাৎ সাক্ষাত হয়েছিল বাইতুল্লাহর দুজন শায়েকের সাথে, বাইতুল্লাহর সিঁড়িতে ওঠার পথে ছোট্ট কথোপকথন যে এমন আত্মিক সম্পর্ক তৈরি করতে পারে তা আমার জানা ছিলোনা। দুজন শায়েক পথের পরিচয়ে তাদের অফিসে নিয়ে কথা বলে এবং কন্টাক্ট নাম্বার প্রদানের মাধ্যমে এক অভুতপূর্ব সম্পর্কের সৃষ্টি করে। তাদের অফিসে বসিয়ে নানা খাবারে মনোমুগ্ধকর আপ্যায়ন এবং ফেরার পথে ব্যাগ ভর্তি উপহার আমাকে সত্যি মোহিত করে। পরবর্তীতে আমার কক্ষ-সাক্ষীদের নিয়ে দেখা করতে গেলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমাদের সকলের মনকে ছুঁয়ে যায়। কেবল আপ্যায়ন নয় আমাদের সাথে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে তাদের পক্ষ থেকে যে প্রাণান্তকর ভালোবাসার প্রকাশ পাই তা সত্যিই অবর্ণনীয়।

এই সফরে আমি পরিচিত হয়েছি চীন, মরক্কো, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়ার মুসলিম ভাইদের সাথে। এদের মাঝে চাইনিজ মুসলিম ভাইয়েরা এখনো যোগাযোগ করে তাদের ভাষায় কথা বলতে পারার জন্য। বাইতুল্লাহর শায়েকও যোগাযোগ রেখে চলেছেন। হজ্জ সফর থেকে ফিরেও অধিকাংশ হাজীগণের আত্মসংশোধনের অবিরাম চেষ্টা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিনিময় আমার জীবনের অদ্ভুত সুন্দর এক অভিজ্ঞতা। আল্লাহ যদি কবুল করেন তাহলে একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি হজ্জ সফরই আমার জীবনের সেরা সফর, সর্বোৎকৃষ্ট সম্বল।

# মা

মো. আমিনুল ইসলাম
সিকিউরিটি গার্ড, অ্যাডমিন
অবনী টেক্সটাইলস লিমিটেড

মা তোমার মতো এত আদর,
কেউ তো করে না।
তোমার মতো মধুর সুরে,
কেউ যে ডাকে না।
শিশুকালে ছিলাম যখন,
আমি তোমার কোলে।
কতো সোহাগ করছো তুমি,
দিছো চুমু গালে।
ও মা ওগো মা
তুমি আমার মা
তোমার মতো এ জগতে,
কাউকে পাবো না।

সোনা, ময়না, জাদুমণি,
কতো নামে ডাকো।
এত আদর সোহাগ তোমার,
কভু ফুরায় নাকো।
মিষ্টি মধুর নামটি তোমার
যত বারই ডাকি
অশ্রুতে ভিজে যায়
আমার দুটি আঁখি।
ও মা ওগো মা
তুমি আমার মা
তোমার মতো এ ধরাতে
নেইকো তুলনা।

হাঁটতে গিয়ে যখন আমি,
পিছলে পড়ে যাই।
আমার লাগার আগেই যেন,
লাগে মায়ের কলিজায়।
যা বলিয়া ডাক দিলে আর,
কেউ তো শুনে না।
মায়া করে খোকা বলে আর,
কেউ যে ডাকে না।
ঢাকা থেকে যেদিন আমি
বাড়ি চলে যাই,
হৃদয়খানি হয় যে উদাস
পাইনা কোন ঠাঁই।
ও মা ওগো মা
তুমি আমার মা
তোমার মতো এ ধরাতে
কাউকে পাবো না
মা, মা, ও মা।

# হাওড়ে হাঙ্গামা

আরিফ ভূঁইয়া
গ্রুপ সিইও
ব্যাবিলন গ্রুপ

সিএনজি বেশ জোরের সাথেই ছুটে চলছে। খিলগাঁও ফ্লাইওভারের উপর থেকে কমলাপুর স্টেশনের রেললাইনগুলো দেখা যাচ্ছে। শুক্রবার জুমআর পরের ঢাকার রাস্তা অন্যদিনের তুলনায় অনেকটাই ফাঁকা থাকে। সায়দাবাদ বাস স্টেশনের পিছনের রাস্তায় পৌঁছতেই বাসের হর্ন, রিকশার টুংটাং, হকারদের আওয়াজ বেড়ে গেল। বাস স্টেশনে ঢোকার সময় ভিতরে এক ধরনের বাড়তি উত্তেজনা হচ্ছিল। পাশে বসা হাসিবের দিকে তাকালাম। যদি ওর চেহারায় কিছু বুঝা যায়। মানুষ তো সারাক্ষণই আশেপাশের অবস্থার সাথে নিজের তুলনা করতে থাকে।

সিএনজি ড্রাইভার বলে উঠল, "মামা, শুক্রবার দিন, খ্যাপ কম, পয়সা বাড়ায় দিয়েন।" বুঝলাম ঢাকা-কুলিয়ারচর বাস কাউন্টারে পৌঁছে গেছি। কাঁধের উপর রাখা গামছাটা গলায় পেঁচিয়ে, ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে নেমে বাস কাউন্টারের পাশে অপেক্ষা করছিলাম। হাসিব গেছে পরবর্তী বাসের খোঁজ করতে। বিকাল তিনটার মতো বাজে। মনে মনে একটু শঙ্কা, "বাস পাবো তো?" বিভিন্ন গন্তব্যের বাসের হেল্পারদের যাত্রী আকর্ষণের জন্য চিৎকার, 'এই শসা-ক্ষিরাই, চানাচুর, ঝাল চানাচুর...' এইসব কানে আসছিলো আর গতকাল সন্ধ্যার কথা ভাবছিলাম। ঝোঁকের মাথায় বের হলাম। কোথায় যাবো নির্দিষ্ট করে জানি না, আর কীভাবে যাবো সেটাও পরিষ্কার নেই। আপাতত গন্তব্য কালনী নদীর পাড়ে অষ্টগ্রাম নামে হাওড়ের উপর একটা গ্রাম, কুলিয়ারচর থেকে উত্তর পূর্ব দিকে। সেখান থেকে হাওড়ের মধ্যে দিয়ে আরও উত্তর পূর্বের কোনও জায়গায় নৌকায় করে যাওয়ার ইচ্ছা। ফেরত আসবো সিলেট অথবা হবিগঞ্জ জেলা দিয়ে বাসে করে। "চল, টিকেট হইয়া গেসে"– হাসিবের কথায় চারদিকের চাঞ্চল্যকর শব্দগুলো আরও বেড়ে গেল। বাসে উঠে বসলাম। সায়দাবাদ - ভৈরব - কুলিয়ারচর রুট। কুলিয়ারচর যেতে চার ঘণ্টার মতো লাগবে। নতুন জায়গায় যাওয়ার উত্তেজনা টের পাচ্ছি। কুলিয়ারচর একটা গঞ্জ, এক ধরনের ব্যাবসায়িক কেন্দ্র। গঞ্জগুলো কেমন হয় ভাবছি, সেই সাথে মনের মধ্যে হাওড় নিয়ে অনেক রকম ভাবনা আসা যাওয়া করছে। শীতের দিন শেষের ঠান্ডা বাতাস গায়ে এসে বাড়ি খাচ্ছে।

সন্ধ্যা সাতটায় কুলিয়ারচর গঞ্জে পৌঁছলাম। চারদিকে ব্যস্ততা। থান কাপড়ের দোকানের সারি পার হতেই, মশলার গন্ধ নাকে আসলো। গরম মশলা, পেঁয়াজ-রসুনের দোকানের পরই গুড়া মশলার দোকানের সারি, গন্ধ তীব্র। হাতের ডানে সিনেমা হলের ডায়ালগ রাস্তা থেকে স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট এর মাঝামাঝি জায়গায়। সামনেই মাছের পাইকারি বাজার, হাওড়ের মাছের বড়ো অংশ এই গঞ্জ দিয়েই দেশে-বিদেশে পৌঁছে। হাতের বায়ে একটা সিঁড়ি রাস্তা থেকে উপরে উঠে গেছে। দোতলায় বড়ো বড়ো সিলভারের ডিশে লাল তরকারি আর বড়ো গামলায় ভাত জমা করা। তারপর দুই সারি চৌকি। কোনোটায় আবার মশারি টানানো। জায়গাটায় আলোর স্বল্পতা। দুই একটা মশারির ভিতর থেকে সিগারেটের আলো উঠানামা করছে। এটাই সম্ভবত চিত-কাইত হোটেলের টিপিক্যাল চেহারা। একটা চৌকির উপর কাঠের বাক্সে হেলান দিয়ে বসা এক ভদ্রলোক। এটাই এই বোর্ডিং এর রিসিপশন এবং লবি। ১৫০ টাকায় আমরা তিন তলার ভিআইপি রুম পেলাম। চাবি নিয়ে ম্যানেজার নিজেই আমাদের সাথে উপরে রওনা দিলো।

কালো রং করা লোহার ফ্রেমে টিনের দরজা। ভিতরে আলো জ্বালাতেই প্রথমে মনে হলো adventure করতে এসে ভুল করলাম না তো? মন পুরো Confused, Rejection, acceptance, exploration এর মাঝামাঝি (কীভাবে থাকার মতো ব্যবস্থা করা যায়) এই সমস্ত চিন্তা। সবুজ রং করা দেয়ালে বিভিন্ন শিল্পকর্মের নিদর্শন। কক্ষে থুথু শুকায়ে যাওয়া দাগ, হাতে লিখা (রফিক + শিল্পি) সহ অনেক রকম কারুকাজ। লোহার জানালাটা খুলতেই উল্টা দিকের সিনেমা হলের আওয়াজ আর নদী থেকে ভেসে আসা হালকা বেগে শীতের হাওয়া। মনটা ভালো হয়ে গেল। হাওড়ের পাবদা মাছের লাল ঝোল দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে, সদ্য কেনা নতুন চাদরে ঢাকা তেল চিটচিটে তোশকটা ঢেকে শুয়ে পড়লাম। সামনের জানালা দিয়ে অন্ধকার আকাশটা দেখা যাচ্ছে।

বাজারের হইচই মনে হচ্ছে দূর থেকে ভেসে আসা আওয়াজ। ভাবছিলাম কুলিয়ারচর ঘাট থেকে নৌকায় কালনী নদী দিয়ে আরও উত্তর পূর্বে কিশোরগঞ্জ জেলার মধ্যে অষ্টগ্রাম। তারপর উত্তর পূর্বে হবিগঞ্জ অথবা সুনামগঞ্জ জেলার ভিতর দিয়ে সড়ক পথে ঢাকা। ভাবনায় মনে হচ্ছে জলবৎতরলং একটা প্ল্যান। কিন্তু তারপর কী? কিছুই তো জানি না ...

শীতকালের নদীর চরে বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি অস্থায়ী হোটেল। অপেক্ষায় ছিলাম পরোটা, ভাজি আর ডিমের মামলেট এর জন্য। কুয়াশায় কয়েক হাত দূরে কিছুই দেখা যায় না। পানিতে নৌকার বৈঠার শব্দ আর মাঝিদের কথায় বোঝা যায় নদীর সাথেই হোটেলের সারি। একটা বড়োসড়ো ছইয়ে ঢাকা নৌকা ঠিক করা হলো, আপাতত অষ্টগ্রাম। ৮০০ টাকা ভাড়া। যাত্রী আমরা দুইজন। মঝবয়সী মাঝি। সাদা কালো চাপ দাড়ি। কুয়াশার চাদরে ঢাকা কালনী নদী দিয়ে নৌকা চলছে। নদীর কালো পানি আর ঘোলা কুয়াশা ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে মাঝিদের হাঁকডাক, নিজেদের অবস্থান জানান দেওয়ার জন্য। দশটায় অষ্টগ্রাম ডাকবাংলো ঘাটে নৌকা থেকে নামলাম।

ঘণ্টা দুই ব্রেক হাসিবের দাদার বাড়িতে। গন্তব্য সম্বন্ধে একধরনের ঝাপসা আন্দাজ। তোশক, বালিশ, টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি শীতের পিঠা, হাঁসের মাংস আর মজবুত আলী নামে বয়স্ক একজন সঙ্গী (যাকে আমাদের গাইড করার জন্য দেয়া হয়, যদিও ঘটনার পরিক্রমায় দেখা গেছে তাকেই আমাদের গাইড করতে হয়েছিলো) নিয়ে একই নৌকা ভাটির দিকে চলা শুরু করলো। ২০০৭ সালে গুগল ম্যাপের সাহায্য পাওয়া যেত না। আগের দিন হাসিব একটা ম্যাপ জোগাড় করেছিলো। বাংলাদেশের নদীর ম্যাপ। ওই ম্যাপ দেখে একটা টেনটেটিভ প্ল্যান হলো। কালনী নদী ধরে আমরা আরও উত্তরে যাবো, পরে কালনী নদীই কুশিয়ারা নামে আরও উত্তর পূর্বে বাঁক নিয়েছে। যেতে থাকলে একসময় ঢাকা-সিলেট হাইওয়ের উপর শেরপুর। আপাতত গন্তব্য শেরপুর ব্রিজ। পথে যেখানে সন্ধ্যা সেখানে যাত্রা বিরতি। আর যাত্রা পথে নদীর জেলেদের মাছ কেনার ইচ্ছা নিয়ে বাকি গ্রোসারি অষ্টগ্রাম থেকেই নেয়া হলো। এই চিন্তার সরলতায় অনেকগুলো বাস্তব বিষয় টোটালি উপেক্ষিত– কতটুকু দূরত্ব, রাতে কোথায় থাকা হবে, নিরাপত্তার বিষয়।

সূর্য মাথার উপর, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধান ক্ষেত। কালনী নদী কোথাও সরু, কোথাও কিছুটা চওড়া। প্রায়ই নদীর ধারে ছোটো ছোটো গ্রাম। অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামের বাড়িগুলোর পিছনের দিকটাই নদীর দিকে। নৌকার ছইয়ের উপর বসে হাওড়ের জীবন নিয়ে কথা হচ্ছিলো মজবুত আলীর সঙ্গে। সে যদিও চুপচাপ থাকতেই মনে হয় বেশি

পছন্দ করে। একজন জেলের কাছ থেকে কিছু মাছ কেনা হলো। মাঝির সহকারী মাছ কেটে পরিষ্কার করা, চাল-ডাল ধোয়া, চুলায় আগুন জ্বালানোসহ রান্নার সব আয়োজন করছে আর আমি এরই মধ্যে মাছের ঝোল আর খিচুড়ি রান্না করবো সেটা ভেবে নিলাম। নৌকা চলছে উত্তরে ভাটির দিকে, নৌকার সামনের দিকের পাটাতনে বসে জীবনের প্রথম মাছ রান্না একসময় শেষ হলো।

নৌকার ছইয়ের উপর শুয়ে ছিলাম গায়ে একটা চাদর মুড়িয়ে। সূর্যের কিছুটা তাপ লাগছে সেই সঙ্গে শীতের হালকা বাতাস। ছোটোখাটো একটা দিবানিদ্রাও হয়ে গেলো। কদমচাল নামে একটা জায়গা পার হচ্ছিলাম। ছোটোখাটো ঘাট। কাটাখাল নামে সামনে একটা বাজার। সন্ধ্যার কিছু আগে ওখানে পৌঁছাবো। হাওড় এলাকায় রাতে নৌকা চালানো বিপজ্জনক। চুরি, ডাকাতির ভয়। সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম বাজার জাতীয় জায়গায় রাতে নৌকায় ঘুমাতে হবে। নদীভাঙা একটা ঘাট কাটাখাল। পাড়ে বাঁশের তৈরি কিছু দোকান আর চায়ের দোকান। পাঁচ/সাতটা ছোটো-বড়ো নৌকা ঘাটে বাঁধা আছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হলো রাত কাটানোর জন্য নিরাপদ। এই নিরাপদ মনে হওয়াটা যে কতটা অনিরাপদ ছিলো সেটা যদি আমরা তখন জানতাম!

ঘাটের মাঝামাঝি একটা ফাঁকা জায়গা দেখে মাঝি নৌকা ভিড়াচ্ছে। মজবুত আলী পিছনের ছইয়ের উপর বসে ঘাটের ব্যস্ততা দেখায় ব্যস্ত। মাঝির অ্যাসিস্ট্যান্ট দিক নির্দেশনা দিচ্ছিল। নিরীহ চেহারার অনাড়ম্বর গ্রাম্য বাজার। ভাবছিলাম এইখানে চা- টা খেতে কেমন হবে! নৌকার সিঁড়ি দিয়ে পাড়ে উঠতে হবে। কিছু মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে হাঁটাহাঁটি করছে। আর কিছু মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি আমাদের নৌকা এবং নৌকার মানুষগুলোর দিকে। খুব পরিষ্কার বুঝা না গেলেও তাদের দৃষ্টির মধ্যে কিছু একটা ছিলো যেটা আমাদের অবচেতন মনে কিছুটা অস্বস্তির ছোঁয়া দিয়ে গেছে। চা খেতে যাওয়ার আর ইচ্ছা হলো না। সময়ের সাথে আমাদের নৌকা নিয়ে পাড়ের মানুষদের আগ্রহ বাড়তে থাকলো। মানুষের জটলাগুলো এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে। আমাদের নৌকা কেন্দ্র করে কিছু কথাবার্তা নৌকার ভেতরেও শোনা যাচ্ছিলো। হারিকেনের আলোয় আমি আর হাসিব টুকটাক কথাবার্তা বলছিলাম। আমাদের নৌকা নিয়ে পাড়ের মানুষদের মধ্যে অবিশ্বাস দানা বাঁধছে, সেটাও অনুভব করছিলাম দুজনেই। কিছুটা ভয়ও ঢুকতে শুরু করছিলো মনের মধ্যে। ঘণ্টা খানেক পর নৌকার পিছন দিক দিয়ে বড়ো মাঝি এসে বললো, "এলাকার লোকজন আমরারে জিগাতাসুইন আপনারার পরিচয়, কিতার লাগি আইসুইন এই ঘাটে, তারা বিদেশীগো

এই ঘাটে রাইত কাটাইবার দিবো না" ইত্যাদি। মনের ভয় আরও কিছুটা বাড়লো। হাওড়ের মাঝখানের যেই নদীপথে বিকালে ছিলাম সেখানে রাতের অন্ধকারে নৌকা নিয়ে ফেরত যাওয়ার চিন্তা মাথায় আসতেই বুঝলাম সেটা সম্ভব না। ডাকাতি নির্ঘাত হবেই। চোখের সামনে ট্যাটা, কোচ, রামদা জাতীয় জিনিসপত্র ভেসে উঠলো। ভয়ের সাথে রাগও হতে থাকলো। আমরা তো গুড সিটিজেন, হাওড়ে বেড়াতে এসেছি। ঘাট তো পাবলিক প্লেস। যে কেউ এখানে থাকতে পারে। ওরা কারা আমাদের বাধা দেওয়ার! মনের এই Conflict আমাদের বাস্তব, অনুধাবন করতে অবশ্য কোন সাহায্য করেনি। ঘাটে গিয়ে মানুষগুলোর কাছে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার না করে আমরা নৌকার মধ্যেই বসে থাকলাম দম্ভের সাথে।

অষ্টগ্রাম থেকে নিয়ে আসা হাঁসের গোস্ত আর রুটি দিয়ে খাওয়া শেষ করলাম। আসন্ন বিপদ অনুধাবন না করে একসময় শুয়েও পড়লাম। হালকা ঘুমের মধ্যেই ছিলাম। ঘুম ভাঙলো ছইয়ের ঠিক বাইরে নৌকার দরজার দুই/তিন জন মানুষের ধাক্কাধাক্কির আওয়াজে। আমাদের ডাকছে বের হওয়ার জন্য। পাড় থেকেও মানুষের কথাবার্তা আগের চেয়ে বেশি। অপমানবোধ আর ভয় মনে নিয়ে নৌকার ছইয়ের ভিতর থেকে বের হলাম আমরা দুজন। বর্শা হাতে গ্রামের দুই চৌকিদার বললো, "আফনেরা নৌকায় থাকি বাইর অইন। আমরার লখে আইন।" পাড়ে উত্তেজিত জনতার কেউ কেউ আমাদের লক্ষ্য করে কিছু গালি এবং ধমকও ছুড়ে দিচ্ছিলো। 'জানেন আমি কে?' –হাসিবের এই কথার সাথেই একজন চৌকিদার হুংকার দিতেই আমরা পাড়ের দিকে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম।

উত্তেজিত জনতার তির্যক প্রশ্ন, অভিযোগ এবং কিছু অবোধ্য আওয়াজ কানে আসছিলো। জনতাবেষ্টিত আমরা পাঁচজন। এই অবস্থায় হাসিবের জমিদার বমড় আরও জোরের সাথে জেগে উঠলো। জানেন আমি কে? আপনাদের এই পুরা এলাকার মালিক ছিলো আমার দাদার বাবা। আমি অষ্টগ্রামের সৈয়দ বাড়ির ছেলে। আপনারা সবাই আমাদের প্রজা ছিলেন। ব্যাস! সাথে সাথেই অ্যাকশন। গালাগালি তীব্র আকার ধারণ করলো। কিছু বর্শার ধারালো অংশ হয়তো কয়েক ফিট দূরে আটকে থাকলো। ঠিক সময় মতো জনতার হট্টগোলের মধ্যে জনতার নেতার উপস্থিতি পরিষ্কার হতে থাকলো। তার নাম এখন আর মনে নেই। কাটাখালের মেম্বার। মানুষকে কিছুটা ঠান্ডা করলেন। এরই মধ্যে আমি জমিদার তনয়কে বেঁচে থাকার স্বার্থে সাইড লাইনে পাঠালাম। তারপর জনতার মুখোমুখি হয়ে বুঝানোর চেষ্টা করলাম যে, "আমরা শহরের শিক্ষিত মানুষ, হাওড় দেখার সৎ উদ্দেশে ঢাকা থেকে আগের দিন রওনা দিয়েছি। গন্তব্য

কিছুটা অস্পষ্ট। দূরবর্তী অষ্টগ্রামের মানুষ আমাদের সম্মান করে। কাটাখালের জন্য আমরা কোন বিপদ হতেই পারি না।"

কাটাখালের মানুষ, যারা সর্বক্ষণই অচেনা ডাকাতের বিপদে থাকে, তাদের জন্য এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট হলো না। মেম্বার সাহেব আমাদের গণপিটুনির হাত থেকে বাঁচালেও সিদ্ধান্ত দিলেন যে, আমাদের এই ঘাট থেকে এখন নৌকা নিয়ে চলে যেতে হবে। রাত প্রায় এগারোটা। বিভ্রান্তি হলো কোনটা বড়ো বিপদ। কাটাখালের জনতার হাতে ট্যাটার আঘাতে মারা যাওয়া, নাকি পথে ডাকাতের হাতে মারা যাওয়া। শুনেছি এই এলাকার ডাকাতরা নাকি বেশি ঝামেলা না করে গলা কেটে পানিতে ভাসিয়ে দেয়।

মজবুত আলী হঠাৎ বলে উঠলো, "আমরার মজজিদের ইমাম সাব আফনেরার গ্রামের মানুষ। হ্যারে ফোন দেইন। হ্যায় আমরারে চিনে।" অবাক লাগলো দেখে যে, জনতার মধ্যেও আমাদের সাহায্য করার একরকম প্রচেষ্টা দেখা গেল। তখনকার দিনে মোবাইল নেটওয়ার্ক এত বিস্তৃত না থাকলেও ফোন করার দোকান ছিলো। মেম্বার সাহেব আমাদের নৌকায় ফেরত পাঠালেন আর একজনকে দায়িত্ব দিলেন আমাদের আইডি চেক এর জন্য।

পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ঠান্ডা। নৌকার ভিতর বসে আছি। বাইরের থেকে ডাক এলো। এইবার সম্পূর্ণ ভিন্নরকম অভ্যর্থনা। একেবারে সুস্বাগতম। অল ক্লিয়ার, জানালেন মেম্বার। এমনকি উনি আমাদের এই শীতের রাতে কষ্ট করে নৌকায় ঘুমাতেই দিবেন না। তার ঘরে সদ্য কেনা ৪৫ কেজির তুলা দিয়ে বানানো নতুন জাজিম। সেটা উনি আমাদের ছেড়ে দিবেন। তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বিদায় করলাম। সেই একই চৌকিদার এসে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে বললো, সে পাহারায় থাকবে।

পরদিন, ভ্রমণের তৃতীয় দিনে সকালে দ্রুত কাটাখাল ত্যাগ করলাম। ঠিক হলো আপাতত অ্যাডভেঞ্চার শেষ হবে পরবর্তী বাজারে, আজেমেরীগঞ্জ। সেখান থেকে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগলো আজমেরীগঞ্জ পৌঁছাতে। তারপর চান্দের গাড়িতে বানিয়াচং। চান্দের গাড়ি ধানের জমির উপর দিয়েই চলাচল করে শুধুমাত্র শীতকালে। বানিয়াচং থেকে হবিগঞ্জ হয়ে ঢাকা পৌঁছাতে আমাদের রাত দশটার মতো বেজে গেল। সেই থেকেই আমাদের হাওড় ভ্রমণ এর শুরু। কিন্তু পরবর্তীতে শীতের হাওড়ে আর কখনো বেড়ানো হয়নি। শুধুই বর্ষার হাওড়।

# ফিনিক্স ভবনে সেই দিনটি

মো. শাহজালাল মিয়া পলাশ
এজিএম, ইনফরমেশন টেকনোলজি
ব্যাবিলন গ্রুপ

*২৫ শে ফেব্রুয়ারি ২০০৬ শনিবার*
ঘড়ির দিকে তাকালো রবিন, সকাল দশটা। এলিফ্যান্ট রোডের বাটা সিগন্যাল মোড়ে এই সময়টায় প্রচুর গাড়ির চাপ দেখা যায়। প্রায় ১৫ মিনিট যাবত একটা সিএনজির জন্য দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কোনও খালি সিএনজির দেখা মিলছে না।

ঠিক এমন সময় রাস্তার অপর পাশ থেকে দ্রুত আসতে দেখা গেল রঞ্জুকে। কাছে এসেই হাঁপাতে লাগলো। একই অফিসে কাজ করে রঞ্জু আর রবিন।

– কী রঞ্জু আপনি এলেন যে? আজকে তো আমার একার যাওয়ার কথা।
– আর বলবেন না রবিন ভাই, বস বলে পাঠালো, বলল তুমিও যাও, কী আর করা। আমি ভেবেছিলাম যে আপনি সিএনজি নিয়ে অলরেডি চলে গেছেন, এসে আপনাকে পাব না। যাইহোক চলেন একসাথে যাই।

রবিনের এটা প্রথম চাকরি। বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ হওয়ার পর গত এক বছর যাবত এখানে কাজ করছে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। সপ্তাহের প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও কোম্পানিতে বিভিন্ন কাজে বা মিটিং এর জন্য যেতে হয়। আজকে যেখানে মিটিং করার জন্য যাচ্ছে সেই কোম্পানির নাম ফিনিক্স টেক্সটাইল, তেজগাঁও নাবিস্কো মোড়ে অবস্থিত।

এলিফ্যান্ট রোড থেকে নাবিস্কো মোড়ের দূরত্ব বেশি না, কিন্তু রাস্তায় প্রচুর যানজটের কারণে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হচ্ছে। কাওরান বাজার পার হয়ে সিএনজি-টি এগিয়ে যাচ্ছে সাত রাস্তার দিকে। সকালের মিষ্টি আলো সিএনজির গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ভেতরে এসে অদ্ভুত আলোছায়ার খেলা তৈরি করেছে।

সিএনজির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ঘাড় ফেরাতে প্রথমেই চোখে পড়ল একটা বড়ো সাইনবোর্ড, যাতে লেখা "ফিনিক্স হাসপাতাল নির্মাণাধীন ভবন।" রাস্তার পাশেই প্রধান ফটক, ভিতরে ঢুকে গেল রবিন এবং রঞ্জু, ভিতরে ঢুকে প্রথমে কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। অনেক পুরোনো বিল্ডিং তবে প্রচুর লোকজনের সমাগম চোখে পড়ল। সবাই কাজ করছে। কনস্ট্রাকশনের একটা দলকে দেখা গেল সিমেন্ট বালু নিয়ে কাজ করতে, আবার একটা

দলকে দেখা গেল বিল্ডিং এর বিমে কিছু একটা কাজ করছে। বিল্ডিং এর ভেতরটা পুরোটাই অন্ধকারময়, ভালোভাবে কোন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মনে মনে অবাক হয়ে রবিন ভাবে ঠিক জায়গায় এলাম তো!

ডান পাশে রয়েছে দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি। রবিন এবং রঞ্জু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলো। অফিসের মত একটা জায়গা পাওয়া গেল যার প্রথমেই রিসিপশন। পুরো রিসিপশনটা কাঠ দিয়ে ডেকোরেট করা অনেক পুরোনো ডিজাইন দেখেই বুঝা যাচ্ছে।

রিসিপশনে একজন ভদ্রলোককে দেখা গেল। তিনি বসে গভীর মনোযোগ সহকারে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করছেন। খানিকক্ষণ বাদে একটু বিরতি নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কার কাছে যাবেন? রবিন বলল, হারুণ সাহেব আছেন? উনার সাথে দেখা করতে এসেছি, এলিফ্যান্ট রোড থেকে এসেছি বললেই হবে। পাশেই একটা সোফা দেখিয়ে বসতে ইশারা করলেন রিসিপশনে বসা লোকটি।

বসতে বসতে রবিনের মনে হল, এ কোন বিচিত্র অফিসে এসে পড়লাম। তার উপর রিসিপশনে বসা সাদা রঙের পাঞ্জাবি পরা লোকটিকে একটু কেমন যেন মনে হল। কেমন করে যেন ওদের দুজনকে দেখছিল। যাইহোক কিছুক্ষণ পরেই ডাক এলো ভিতরের রুমে যাওয়ার জন্য। দরজায় টোকা দিয়ে ভিতরে ঢুকলো রবিন এবং রঞ্জু।

ভদ্রলোকের নাম কাজী হারুণ, এখানকার নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার, বয়সে তরুণ। রুমে ঢুকতেই দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, বসুন, কী খাবেন? আমরা চা খেয়ে এসেছি, ধন্যবাদ। একটা ফাইল বের করে টেবিলের উপর রাখলেন, -এই যে এটা হচ্ছে আমাদের বিল্ডিং এর নকশা। এই নকশা মোতাবেক কোথায় কী লাগাতে হবে, বসাতে হবে সেটা আপনাদের কাজ। আমি আশা করি আপনাদের প্ল্যানিং এবং বাজেটটা দুদিনের মধ্যে আমাকে জমা দিবেন।

ফাইলটা নিতে যাবে রবিন ..... এমন সময় বিকট শব্দে পুরো বিল্ডিংটি কেঁপে উঠলো। সিলিং থেকে খসে খসে পড়তে শুরু করল আস্তরণগুলো। মুহূর্তের মধ্যেই পুরো রুমটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল ধুলোয়। বুঝতে বাকি রইল না যে বিল্ডিংটি ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছে। এক সেকেন্ডের জন্য পরস্পরের দিকে তাকালো রবিন এবং রঞ্জু। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো।

যেদিক থেকে রুমের ভিতরে ঢুকেছিল, দৌড়ে সে দিক দিয়ে রুম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করল রবিন। সেকেন্ডের ব্যবধানে রুমটা নিচের দিকে দেবে যেতে লাগলো। গায়ের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে দরজা বরাবর একটা লাফ দিল সে, তারপর আর কিছু মনে নেই.....। যখন হুঁশ ফিরল তখন এক ধ্বংসস্তুপ এর ভিতর নিজেকে আবিষ্কার করলো রবিন। যে রুম থেকে সে বের হয়েছিল সেই রুম

সহ, পুরো ভবনটি মাটির নিচে দেবে গিয়েছে। চারদিকে শুধু ধুলা আর ধুলা। রঞ্জুকে দেখতে পেল একটা দেয়ালের নিচে চাপা পড়া অবস্থায়, মারা যায়নি, গোঙানির মতো শব্দ করছে। পায়ের

কিছুটা অংশ চাপা পড়েছে একটা দেয়ালের নিচে। বাম পাশে তাকিয়ে দেখলো রিসিপশনের মধ্যে ওই লোকটা বসে আছে অক্ষত অবস্থায় এবং হাতে রয়েছে কুরআন শরীফটি। সবকিছু কেমন যেন ঝাপসা হয়ে এলো, দ্বিতীয়বারের মতো জ্ঞান হারালো রবিন।

তার জ্ঞান ফিরলো ফায়ার সার্ভিসের লোকজনদের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে। পাশের একটা ভাঙ্গা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলো হাজার হাজার মানুষ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ফায়ার সার্ভিসের লোকজন ইতোমধ্যে একটি লম্বা মই দিয়ে এই ভবনের দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত উঠে এসেছে। একজন লোক গ্রিল কাটার নিয়ে উঠেছে জানালা কাটার জন্য। হঠাৎ কানের কাছে একজন লোক ফিসফিস করে বলতে লাগলো, ভয় পাবেন না আল্লাহর রহমতে আমরা বেঁচে গেছি। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখল রিসিপশনিস্ট লোকটি, বলল আমার হাত ধরেন, বলে রবিনকে টেনে তোলার চেষ্টা করল। ইতোমধ্যে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন জানালা কাটতে সক্ষম হয়েছে। একজন লোক রবিনকে ইশারা করল সামনের দিকে যাওয়ার জন্য। একটু সামনে যেয়ে ওই লোকটার গায়ের উপর নিজেকে টেনে নিল। আস্তে আস্তে করে রবিনকে সেই কাটা অংশ দিয়ে রুম থেকে বের করে, মই দিয়ে নিচে নামিয়ে আনলো ফায়ার সার্ভিসের লোকটি। শুইয়ে দেওয়া হলো ফুটপাতে খোলা আকাশের নিচে।

আরও তিনজনকে ওই রুম থেকে বের করে আনলো ফায়ার সার্ভিসের লোকজন। সবার শেষে বেরিয়ে এলো রিসিপশনিস্ট লোকটি। চিৎকার করে কান্না করতে ইচ্ছে করছে রবিনের কিন্তু মুখ দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না।

ঘটনাস্থলের পাশে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে নিখোঁজ স্বজনদের খুঁজতে থাকা অসংখ্য নারী পুরুষ। তাদের আহাজারি আর বিলাপে ভারী হয়ে উঠেছে আশপাশের এলাকা। প্রায় একহাজার ফায়ার ব্রিগেড, সেনাবাহিনী, পুলিশ সদস্য দ্বারা তাজউদ্দিন রোডের একটি বিশাল অংশ ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। সীমাবদ্ধ এলাকা ছাড়িয়ে দুর্ঘটনাস্থলকে ঘিরে কয়েকশ উৎসুক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সেই শত শত কৌতূহলী মুখের মধ্যে কিছু উদ্বিগ্ন মুখও আছে যারা এই ছোটো পাহাড়ের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে থাকা পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা পরিচিত।

কিছু লোক তাদের এই চারজনকে ধরাধরি করে একটি গাড়ির মধ্যে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেল। হাসপাতালে নিয়ে দেখা গেল রঞ্জু বাদে সবাই মোটামুটি সুস্থ, রঞ্জুর বাম পা-টা মচকে গেছে। কিন্তু কী অদ্ভুত কাণ্ড, রিসিপশনের সেই লোকটিকে আর দেখা গেল না কোথাও! প্রাথমিক চিকিৎসা শেষ হওয়ার পর সবাইকে রিলিজ করে দিলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বাইরে বের হয়ে দেখেন অফিসের বস এসে দাঁড়িয়ে আছে রবিন এবং রঞ্জুর জন্য। দেখা হওয়া মাত্রই রবিন এবং রঞ্জুকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, আল্লাহর অশেষ রহমত যে তোমরা বেঁচে গেছো। পরে তিনি দুজনকে দুটি সিএনজি করে দিলেন বাসায় চলে যাবার জন্য।

রবিন যখন বাসায় পৌঁছালো তখন বাজে বেলা দুটা। বাসায় দরজা খুললেন রবিনের আম্মা। এই অসময়ে এভাবে রবিনকে দেখে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, -কী হয়েছে তোর? বলল -না, তেমন কিছু না!
বলে ড্রয়িংরুমে সোফায় বসে টিভিটা অন করল রবিন। ততক্ষণে টিভিতে ব্রেকিং নিউজ দেখাচ্ছিল-

*তেজগাঁও-এ নির্মাণাধীন ফিনিক্স ভবন বিধ্বস্ত। প্রধান প্রকৌশলীসহ ২৩ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু!*

সারা শরীর কাঁপছে রবিনের। নিজের রুম থেকে টাওয়েলটা হাতে নিয়ে বাথরুমের ভিতরে ঢুকলো, ভাবল এই কথা কাউকে বলবে না। কে বিশ্বাস করবে, মহান রাব্বুলআলামিনের অশেষ কৃপায় কীভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সে আজ রক্ষা পেয়েছে? রিসিপশনে বসা সেই লোকটির কুরআন তেলাওয়াত কানে বাজতে লাগলো "ফাবি আইয়ে আলা ইরাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান....।" শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে সুইচটা অন করে দিল রবিন। এক প্রশান্তিময় জলধারা মাথা থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পা পর্যন্ত পড়তে লাগলো তার ...

# আমাদের ব্যাবিলন

সাদিয়া আলম
সিনিয়র কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

*দু'হাত বাড়িয়ে,*
*আছে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে।*
*নবীনকে করতে বরণ,*
*প্রবীণকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ।*

হ্যাঁ, আমি ব্যাবিলন গ্রুপের কথাই বলছি। অন্য কোন পোশাক শিল্পের কথা নয়। বাংলাদেশে অনেক উন্নত মানের পোশাক শিল্প রয়েছে। ব্যাবিলন গ্রুপ তাদের মধ্যে অন্যতম। অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে ব্যাবিলন আজও স্বনামে ও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। ব্যাবিলনে নতুন/অনভিজ্ঞদের কাজের সুযোগ দেয়া হয়। নতুনদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বুঝিয়ে দেয়া হয়। অনেক স্বনামধন্য কোম্পানিতে ব্যাবিলনের প্রাক্তন কর্মীগণ বিভিন্ন পদে দক্ষতা ও সুনামের সাথে কাজ করতে দেখা যায়। বিভিন্ন কোম্পানি ইন্টারভিউয়ের সময় প্রার্থী ব্যাবিলনে কাজ করেছেন শুনলে, ব্যাবিলন গ্রুপের সুনামের কারণে প্রায়ই চাকরির জন্য প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। অন্যান্য কোম্পানি যেখানে নতুন/অনভিজ্ঞ লোকদের ব্যাপারে তেমন একটা আগ্রহী নয়, ব্যাবিলন সেখানে নতুনদের স্বাগত জানায় এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এদের দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলে। ব্যাবিলনের পরিচালকসহ গ্রুপ লিডারশিপ টিম মনে করেন, নতুনদের মধ্যে অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও আগ্রহ থাকে কাজ শেখার।

ব্যাবিলন শব্দের নির্দিষ্ট কোন অর্থ নেই। অনেকে ব্যাবিলন শব্দের অর্থ জানতে চান। কেউ কেউ বলে থাকেন "ভাসমান জাহাজ" আবার কেউ বলে থাকেন "ঝুলন্ত উদ্যান" কিংবা "প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত শহর ব্যাবিলন" সেখান থেকে নামকরণ করা হয়েছে। এই ব্যাবিলন শব্দের অর্থের বিড়ম্বনায় আমাকেও পড়তে হয়েছিল। সঠিক উত্তর জানা ছিল না তাই বলতে পারিনি। ব্যাবিলন শব্দের অর্থ খুঁজতে খুঁজতে একদিন শ্রদ্ধেয় পরিচালক এসএম এমদাদুল ইসলাম স্যারের কাছে জানতে চাইলাম - 'ব্যাবিলন শব্দের অর্থ কী?' স্যারের কাছ থেকে জানতে পারি যে, ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটি তাঁরা ক্রয় করেছিলেন। যার নাম পরবর্তীতে পরিবর্তন করেননি আর পরিবর্তন করার প্রয়োজন বোধ করেননি। ব্যাবিলনের

নির্দিষ্ট কোন অর্থ থাকলে নিশ্চয়ই স্যার আমাকে বলতেন। স্যারের কাছ থেকে আরও জানতে পারলাম, ব্যাবিলন গ্রুপের আগে সুন্দর কনসোর্টিয়াম নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল।

ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড এর যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৬ সালে, প্রায় ১৫০ জন শ্রমিক নিয়ে। উদ্যোক্তাদের একাগ্রতা, ভালো কাজের প্রচেষ্টায় ব্যাবিলনের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে সুরভী গার্মেন্টস লিমিটেড ক্রয় করা হয়। হাঁটি হাঁটি পা করে ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেডের মালিকগণ বর্তমানে বিশটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় ১৫ হাজার শ্রমিক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। যদি প্রত্যেক সদস্যের পরিবারের সংখ্যা চারজন করে ধরা হয় তাহলে ৬০ হাজার লোক এই ব্যাবিলন গ্রুপের উপর নির্ভরশীল। এতগুলো লোক ব্যাবিলন থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়ে তাদের সংসারের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করে থাকে।

আমি ব্যাবিলন গ্রুপে যোগদানের আগে ব্যাবিলন সম্পর্কে যা যা শুনেছিলাম তার সবই পরবর্তীতে মিলে গেছে! সময়মতো বেতন পরিশোধ করা থেকে শুরু করে অন্যান্য সুবিধা সময়মতো দেয়া। কোনও কিছুতেই বিলম্ব করে না প্রতিষ্ঠানটি। আমি মনে করি আমি গর্বিত, ব্যাবিলন পরিবারের একজন সদস্য হতে পেরে। পরিচালকগণ আমাদের নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসে গেছেন। তাঁরা আমাদের নিজের সন্তানের মতো মনে করেন। কখনো ব্যাবিলন পরিবারের কোন সদস্য বিপদে পড়লে নির্দ্বিধায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। এমন ভালোবাসা পাওয়া সত্যিই বিরল! অথচ ব্যাবিলন পরিচালকগণ এই রকম ভালোবাসার ধারাবাহিকতা বহাল রেখেছে যুগের পর যুগ ধরে। ব্যাবিলন কর্তৃপক্ষ তার কর্মীগণের জন্য কল্যাণমূলক কিছু বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যা এখনও বহাল আছে। আসলে ব্যাবিলন গ্রুপের তার কর্মীর প্রতি সহযোগিতার কথা বলে শেষ করার মতো নয়। বিশেষ পদক্ষেপগুলো নিচে দেওয়া হলো-

১. এফ এফ সি (একজন ক্যানাডিয়ান দ্বারা পরিচালিত একটি এতিমখানা)- প্রতি মাসে সেখানে শিশুদের জন্য খাদ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়।
২. ব্যাবিলন এবং টেসকো ক্রেতার যৌথ উদ্যোগে ব্যাবিলন এর কর্মী বা তার সন্তানদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতকল্পে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান।
৩. কর্মচারী বা তার পরিবার/ সন্তানদের জন্য শিক্ষা, বিবাহ এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য প্রদান।
৪. রমজান মাসে ইফতার ও মিলাদ মাহফিল এর ব্যবস্থা করা হয়। এখানে মালিক, কর্মকর্তা ও শ্রমিক সবাই উপস্থিত থাকে।

৫. শীতের সময় দুস্থ শ্রমিক ও দেশের শীত প্রধান অঞ্চলের শীতার্ত মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা।

৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা।

৭. শ্রমিকগণের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়নে গবাদি পশু দান ও আসবাবপত্র প্রদান।

এখানেই শেষ নয়, ব্যাবিলনের মালিক পক্ষ, তাদের মন উজাড় করে আমাদের ভালোবাসেন। শ্রদ্ধেয় পরিচালকগণ বলে থাকেন, ব্যাবিলন আমাদের সকলের। আমরাও গর্বের সাথে বলে থাকি "ব্যাবিলন আমাদের।" তাই, আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে গেয়ে থাকি -

*ব্যাবিলন আমাদের ব্যাবিলন,*
*তুমি প্রাণের স্পন্দন।*

গানের কথা বলতে গিয়ে গত বছরের প্রীতিভোজের কথা মনে পড়ে গেল। ব্যাবিলনকে ভালোবাসে না এমন ব্যক্তি পাওয়া বিরল। কারণ ব্যাবিলন কর্তৃপক্ষ তাদের ভালোবাসা দিয়ে আমাদের মন জয় করে নিয়েছে। সবারই একই রকম গুণাগুণ থাকে না। ব্যাবিলন কে ভালোবেসে আমাদের একজন সহকর্মী গান লিখেছেন ও নিজে গেয়েছেন। তার নাম হলো মোঃ ইয়াছিন।
গানটি হলো-

*আমরা সবাই কর্মচারী,*
*ব্যাবিলনের ভাই।*
*মাস ঘুরাইলে ৭ তারিখে,*
*আমরা বেতন পাই।*

ভালোবাসার গভীরতা কতটা হলে, মনের মাধুরি মিশিয়ে এতে সুন্দর করে গান লিখে উপস্থাপন করা যায়, তা আমার জানা নেই। ব্যাবিলন মিশে আছে আমাদের হৃদয়ে। এখানে শ্রমিক ভাই বোনের স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে লেখাপড়া, প্রতিটি পদক্ষেপে উৎসাহিত করে থাকেন। তাদের আরেকটি মহৎ গুণ হলো, শ্রমিক ভাই বোনদের কাজ করার পাশাপাশি শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ দিয়ে থাকে। এছাড়াও ব্যাবিলনের একজন পরিচালকের স্ব-উদ্যোগে শ্রমিকদের জন্য দুপুরের খাবারে ফরমালিনমুক্ত সবজির ব্যবস্থা করা হয়, যাতে কর্মীগণ সুস্থ থাকে।

তাই বলা যায়,

*বন্ধনীর নীরব বন্ধনে,*
*আছো তুমি স্পন্দনে ব্যাবিলন।*

ব্যাবিলনের গুণের কথা কী আর বলব, যতই লেখি, দেখি আর শেষ হচ্ছে না। ব্যাবিলন গার্মেন্টস শুধু পোশাক শিল্পেই নয়, কৃষি কাজেও সমান তালে অবদান রেখেছে। প্রত্যেক বছর ৫ই জুন পরিবেশ দিবসে বৃক্ষ রোপণ করে আসছে এই গ্রুপের কর্তৃপক্ষ।

প্রায় ১৭ বছর ধরে কথকতা নামে একটি ম্যাগাজিন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে মালিক, শ্রমিক সকলের লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে নির্দ্বিধায় সকলে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। লেখক-লেখিকাদের প্রতি বছর উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে, তারা যেন আরো সুন্দর কবিতা, রম্য-রচনা ও গল্প লিখতে পারে।

এবার না হয় ব্যাবিলন গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে কথা বলা যাক। আমার মতে, ব্যাবিলন পরিবারের সদস্য হওয়া গর্বের বিষয়! এটা বলতে পারি যে, চাকরি পাওয়ার সূত্রে যারা ব্যাবিলন পরিবারের সাথে কাজের সুযোগ পায়।

তারা আজীবন ব্যাবিলন পরিবারের সদস্য। এমনকি ব্যাবিলন ছেড়ে চলে গেলেও তারা কিন্তু ব্যাবিলনিয়ান!

এখন ব্যাবিলনের বাইরে কিছু বলা যাক, ব্যাবিলন গ্রুপের পরিচালকগণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। যেন টাকার অভাবে মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ ব্যহত না হয়। সরকারের পাশাপাশি ব্যাবিলনের মাননীয় পরিচালকগণ আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দেওয়ার জন্য শিক্ষাবৃত্তির এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

এবার আসা যাক একটা ভিন্ন প্রসঙ্গে। বিষয়বস্তু হচ্ছে "বন্ধু"। আমরা বন্ধু নিয়ে অনেক ভালো-মন্দ কথা শুনে থাকি। ভালোর চেয়ে মন্দের পরিমাণই বেশি। অর্থাৎ, ভালোর চেয়ে খারাপটাই প্রকাশ পায় বেশি। এমনও বন্ধু রয়েছে যাদের জন্য, অন্ধকার জীবন আলোর সন্ধান পায়। শুধু আলোর পথের সন্ধানই নয়, সেই আলোতে দাপটের সাথে রাজত্ব করে বেড়ায়। ইরানের বিখ্যাত মনীষী শেখ সাদী (রহ.) বলেছেন,

*সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস,*
*অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।*

সব বন্ধুই ভুল মানুষ নয়, তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ দিচ্ছি। খুব বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই আমাদের কাছেই আছে। আমাদের সকলের প্রিয় পরিচালকগণরাই বন্ধু। তাঁরা গর্বের সাথে স্বীকার করে থাকেন তাঁরা পাঁচজন বন্ধু। তাঁরা সফলতার চূড়ায় পৌঁছে গেছেন। যে লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটি খুলেছিলেন। সে লক্ষ্য পরিপূর্ণভাবে অর্জন করতে পেরেছেন। তা না হলে, ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড আজ ব্যাবিলন গ্রুপে পরিণত হতে পারত না।

# বৃহন্নলাদের গল্প

উম্মে সালমা ডালিয়া
এজিএম, প্যাটার্ন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

ওদের সাথে আমার পরিচয় ঘটে বছর দুয়েক আগে। ওদেরকে মানুষ নানা নামে ডাকে। কেউ বলে হিজরা কেউ বলে তৃতীয় লিঙ্গ, আবার সুন্দর করে অনেকেই বলে বৃহন্নলা বা ট্রান্স জেন্ডার। ছোটোবেলা থেকেই আমি ওদের সম্পর্কে অনেক রকম বাজে কথা শুনেছি। কেউ বলে ওরা নাকি ছেলে ধরা আবার কেউ বলে চাঁদাবাজ, বিশেষ করে নবজাতক বাচ্চাদেরকে ওরা চুরি করে নিয়ে যায়। মোট কথা ওরা মানুষকে হেনস্তা করে চাঁদা আদায় করে। তাই আমি সব সময় ওদেরকে এড়িয়ে চলতাম। বিশেষ করে কারও বাড়িতে নতুন শিশু জন্মগ্রহণ করলে ওরা সেই বাসায় যেয়ে অনেক কিছু আদায় করে নিত। এ ছাড়া বাসে, ট্রেনে, বিভিন্ন দোকানে, মার্কেটে যেয়ে টাকা আদায় করতো। মান সম্মানের ভয়ে সবাই ওদের চাহিদা মতো যা চাইতো তাই দিতো এবং এখনও ওরা ঐ সব কাজ করে চলেছে। এসব কারণে ওদেরকে দেখলে আমার ভয় এবং রাগ দু'টোই কাজ করতো।

২০১২ সালে আমার ছোটোবোনকে ওদের চাঁদাবাজির মুখে পড়তে হয়েছিল। আমার ছোটোবোনের ছেলের জন্মের কয়েক দিন পর ওদের বাসায় একদল হিজরা এসে হাজির হয়েছিলো। তারা এসেই প্রথমে টাকা চেয়েছিল। তখন ছিল দুপুর, আমার বোন ওদেরকে খেতে বলায় একজন বলেছিল খাবার খাওয়ালে আর টাকা দেবেনা। কিন্তু ওদেরকে খাওয়ানোর পাশাপাশি টাকাও দেওয়া হয়েছিল। ওদের মধ্য থেকে একজন আবার কোরবানির মাংস রাখতে বলেছিল যেহেতু কয়েক দিন পর কোরবানির ঈদ ছিল। নেতাগোছের একজন আমার বোনকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে একটা থ্রি-পিসও চেয়েছিল। এবং ওরা ঠিক ঈদের পরে এসে সেগুলো কালেক্টও করেছিল।

যাহোক, এবার আসি আমি কীভাবে ওদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। আমার বাসা থেকে অফিসে যাওয়া এবং আসার পথে ট্রাফিক সিগনালে ওদের সাথে আমার প্রতিনিয়ত দেখা হতো। আগেই বলেছি ওদেরকে আমি এড়িয়ে চলতাম। আমি জানি ওদেরকে কিছু টাকা দিতে হবে, না হলে ওরা ঝামেলা করবে। তাই আমি সিগনালে গাড়ি থামলেই টাকা বের করে হাতে রাখতাম। ওরা চাওয়া মাত্রই দিয়ে

দিতাম। এভাবে আস্তে আস্তে ওদের সাথে আমার যোগাযোগ বাড়তে লাগলো। দূর থেকে আমাকে দেখলেই ওরা দৌড়ে চলে আসতো। আমিও হাসি বিনিময় করতাম। ওদের একটা ব্যাপার আমার কাছে খুব ভালো লাগে। সেটা হলো ওদের একজনকে টাকা দিলে অন্যরা আর আমার কাছে আসে না। এই ব্যবহার মনে হয় ওরা সবার সঙ্গেই করে। কিন্তু যাদেরকে সৃষ্টিকর্তা পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন তারা এদের মতো করে সুশৃংখল ভাবে চলতে পারেনা। সাধারণ ভিক্ষুকেরা বরঞ্চ চালাকির আশ্রয় নেয় একজনের কাছ থেকে একাধিক বার টাকা নেওয়ার জন্য।

এরই মাঝে ওদের সাথে আমার কুশল বিনিময় হতে থাকে। সিগনালে বসে থাকতে থাকতে ওদের সাথে অনেক কথা হতো। ওদেরই একজন দেখতে নারীর মতো কিন্তু শারীরিক গঠনে নারী ও পুরুষের মিশ্রণ রয়েছে। নাম জানতে চাইলে বলল সবিতা। এরপর থেকে ও আমাকে দেখলেই দৌড়ে চলে আসতো। এই সবিতা একদিন আমাকে বলল, এই শোন আমার না তোমাকে অনেক ভালো লাগে। তুমি যাবে আমাদের বাসায়। আমি উত্তরে বলেছিলাম যাবো একদিন। এমনি করে প্রায় প্রতিদিনই ওদের সাথে দেখা হতো। একদিন সিগনালে বসে আছি, সেদিন সিগনাল পার হতে প্রায় পনের মিনিট লেগেছিল। এমনি সময় সবিতা এসে হাজির। আমাকে বললো জানালা খোল কথা বলব, ওকে খুব অস্থির দেখাচ্ছিল, সেদিন সবিতা তার জীবনের অনেক কথা আমাকে বলেছিল। ওর দেশের বাড়ি ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারি থানার একটি গ্রামে। ছোটোবেলায় কেউ বুঝতেই পারেনি যে ওর মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে। আস্তে আস্তে বড়ো হতে থাকে সবিতা। স্কুলে যাওয়া শুরু করে কিন্তু ওর শারীরিক গঠন এবং আচরণে বুঝা যাচ্ছিল যে ও আর দশটা বাচ্চার মতো স্বাভাবিক না। এরপর ওকে ওর সহপাঠীরা নানানভাবে বিরক্ত করতে থাকে। এক সময় গ্রামের লোকজনও জেনে যায়। তারাও ওর পরিবারকে নানা ভাবে অপদস্ত করতে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে পরিবারের লোকজনও সবিতাকে আর সহ্য করতে পারছিলো না। অবশেষে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় প্রিয়জন, প্রিয় এলাকা ছেড়ে সবিতা অজানার পথে পা বাড়ায়। এরপর স্রোতের শেওলার

মতো ভাসতে ভাসতে এক সময় সবিতা ঢাকায় এসে পৌঁছায়।

সবিতাদের মতো মানুষেরা কখনও একা বাস করেনা। ওরা একটা দলে বাস করে এবং ঐ দলে একজন লিডার বা নেতা থাকে। যাকে ওরা গুরুমা বলে সম্বোধন করে, সবিতা ও এরকম একটা দলে স্থান পায়। তবে এই দলে স্থান পেতে সবিতাকে নানান চড়াই-উতরাই পেরোতে হয়েছে। কিন্তু ওর পরিবার যদি ওকে মেনে নিত তাহলে ওকে বাকি জীবন এত বিপর্যয়ের মধ্যে কাটাতে হতো না। ওদেরকে সবাই বলে চাঁদাবাজ, কিন্তু চাঁদাবাজি বা ভিক্ষা যেটাই বলি না কেন সেটা করতে হলেও ওদেরকে স্থানীয় নেতাদের প্রতিদিন পাঁচশত টাকা চাঁদা দিয়ে তবেই রাস্তায় নামতে হয়। প্রতিদিন যদি পাঁচশত টাকা দিতে হয় তাহলে ওদের কত টাকা রোজগার করতে হবে তা কিন্তু আমরা ভেবে দেখছিনা। ওর সব কথা শুনে আমি বললাম তুমি দেশে যাওনা? উত্তরে বলল যাই তবে আমার গ্রামে যাইনা। আশেপাশের গ্রামে যাই। কথাগুলি বলতে বলতে ওর চোখ বেয়ে ঝরঝর করে কষ্টের পানি পড়তে থাকে। আমি বুঝলাম আপনজনেরা ওকে ত্যাগ করেছে তাই ওর অনেক কষ্ট আর অভিমান জমা হয়ে আছে। আমারও সেদিন মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কেন এদের পরিবার এদেরকে ঠিকমতো দেখাশুনা করে না। বাড়ি থেকে, পরিবার থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করে।

আমি যেহেতু মুসলিম তাই আমাদের ধর্মে এদের অধিকার সম্পর্কে কী বলে এবং কী কী ওদের প্রাপ্য সেটা জানার জন্য বেশ কিছু সংখ্যক ইসলামিক স্কলারদের বক্তব্য শুনলাম। আলেমগণ কোরআন হাদিসের আলোকে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানুতায়ালা পবিত্র কুরআনে মানুষের শুধু মাত্র দুটি শ্রেণির কথাই বলেছেন। নারী ও পুরুষ, এছাড়া তৃতীয় কোন শ্রেণির কথা বলেননি। এরা হয় পুরুষ অথবা নারী। মেডিকেল সাইয়েন্স এখন অনেক এগিয়ে গেছে। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে জানা সম্ভব, যে এদের মধ্যে কার পুরুষের অর্গান বেশি আর কার নারীর অর্গান বেশি। ইসলাম বলে যদি কোন ব্যাক্তির এ ধরনের সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে তাকে তার বাবার সম্পদের প্রাপ্য অংশ দিতে হবে। যদি সেই সন্তানের বেশির ভাগ পুরুষের হয় তাহলে অন্যান্য ছেলেরা যা পাবে তাকেও তাই দিতে হবে। আর মেয়ের অংশ বেশি থাকলে তাকে অন্যান্য মেয়ের সমান সম্পদের ভাগ দিতে বলেছেন। এছাড়া এ ধরনের মানুষেরা যদি রূপান্তরিত হয়ে স্বাভাবিক জীবন ধারায় ফিরতে চায় এবং তার যদি পুরুষের ভাগ বেশি থাকে তাহলে অপারেশনের মাধ্যমে পুরুষ হতে পারবে কিন্তু নারী হতে পারবে না। একই ভাবে নারীর ভাগ বেশি থাকলে নারী হতে পারবে চিকিৎসার মাধ্যমে।

সরকারি জরিপমতে বাংলাদেশে প্রায় ৫০,০০০ হিজরা রয়েছে তবে

বেসরকারি জরিপে এর সংখ্যা আরও বেশি বলে জানা যায়। আমরা যারা সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে জন্মগ্রহণ করেছি তাদের উচিত এই মানুষগুলোর ভালোর জন্য কিছু করা। পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের অনেক কিছু করার আছে এদের জন্য। এদের কাজের সংস্থান করে দিতে হবে। এটা একজন মানুষ হিসেবে ওদের অধিকার। যদিও এখন অল্প সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে এদেরকে কাজ করতে দেখা যায়। এদেরকে কর্মসংস্থান করে দিলে এরা সমাজের মূলধারায় ফিরে আসবে বলেই আমার বিশ্বাস।

# দূর থেকে দেখো

ইথার আখতারুজ্জামান
প্রাক্তন সিনিয়র অফিসার, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

তোমাকে কতবার বলেছি আমার খুব কাছাকাছি এসো না।
সব উলট-পালট হয়ে যাবে।
যেভাবে নড়বড়ে হয়ে যায় নতুন সংসার পাতা বাড়ির টিনের চাল, কালবৈশাখী ঝড়ে।
আমাকে বরং তুমি দূর থেকে দেখো।
যেভাবে তুমি কিংবা তোমরা দেখো দূর থেকে কাশবন, পাহাড় কিংবা মেঘ।
তোমার মতন এমন অনেকেই আমার হৃদয় খুব কাছ থেকে খুঁজতে গিয়ে শেষে ফিরে গেছে শূন্য হাতে, শত অভিযোগ রেখে।
আমার হৃদয় এতবার ভেঙে ভেঙে গড়েছে যে তাকে আর ঠিক হৃদয় বলা যাবে না।
বিশ্বাস করো এতটা ভেঙে গড়েনি পৃথিবীর আর কোন নদীর পাড়।
তুমি বরং আমাকে দূর থেকে দেখো।
যেভাবে তুমি কিংবা তোমরা দেখো আকাশ, আকাশের যত নক্ষত্র কিংবা চাঁদের অমসৃণ পৃষ্ঠ।
আমি ক্লান্ত।
আমি আমার হৃদয়ের যাবতীয় ক্ষত নিয়ে দগ্ধ।
আমার কথা এখন আর কেউ বুঝতে পারে না।
আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে সমুদ্র, শরৎ কিংবা হেমন্তে হেলে পড়া হলুদ রোদ।
আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে বাড়ি ফেরার সব আন্তঃনগর ট্রেন।
আমি সত্যিই ক্লান্ত।
এতটাই ক্লান্ত যে দু চোখের পাতা এক করে ঘুমাতে পারিনা সহস্র বছর।
তুমি বরং আমায় দূর থেকে দেখো।
তুমি কিংবা তোমরা যেভাবে দেখো দোতালা বাসের উপর থেকে ডাকনাম না জানা অগণিত মানুষ, যানজট কিংবা ঝুলে পড়া বিব্রত বিলবোর্ড।
দূর থেকে মানুষ সুন্দর, প্রেম সুন্দর, মৌচাকের মৌমাছি সুন্দর।
তোমাকে বলছি, ভালোবাসি শব্দটা এত সহজে অপচয় করো না।
যতটা পারো দূর থেকে দেখো।
এতটা কাছাকাছি এসো না যতটা আসলে পরে, সব জানা হয়ে গেলে আর ভালোবাসতে ইচ্ছে হয় না।
দূর থেকে দেখো, দূর থেকে দেখো।

# ভাবনা বিলাস

সৈয়দ মাহাবুব মোর্শেদ
সিনিয়র অফিসার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

কালো মেঘে ঢাকা আকাশের পানে চেয়ে
আমি ভেবে ভেবে বাস্তবতার নীল জলরাশিতে।
হঠাৎ সূর্যের আলোক ঝালকানিতে,
কল্পনার ছায়ায় খুঁজেছি তোমায়।

অতীতের স্মৃতিগুলো রোমন্থন করে
ভালোবাসার ডায়েরির ঝাঁপটি খুলে
ভাবনা বিলাসের রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে
বোবা চিৎকারে ভেবেছি শুধু তোমারই নাম।

হঠাৎ বৃষ্টিতে গা ভাসিয়ে আর্তচিৎকার করে
কল্পনার রাজ্যে খুঁজে ফেরে মন শুধু বারংবার
অস্তিত্বের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পুরোনো গল্পের ঝাঁপটি খুলে
ভালোবাসার বীজ বপন করে অবচেতন মনে ভাবছি শুধু তোমারই নাম।

কত স্বপ্ন লুকিয়ে ছিল আবেগি মনে, সে তো মরীচিকার অর্ধমৃত্যু আত্মার মতো
ছল ছল দু'চোখের অশ্রু সে তো পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য!
অতঃপর মুষ্টিবদ্ধ দু'হাতের বাঁধন
ভাবনা বিলাসের অন্তিম যাত্রার মতো।

# গাহি মনুষ্যত্বের গান

রুমানা আক্তার
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, হিউম্যান রিসোর্সেস
ব্যাবিলন গ্রুপ

ভেবেছিলাম কথকতার এবারের সংখ্যায় আর লেখা জমা দিবো না। কেননা, যে লেখা জমা দিয়েছিলাম তাতে এতো পরিমাণে কাটাছেঁড়া করা হয়েছে (সঙ্গত কারণেই), এখন মনে হচ্ছে ওই লেখাটাই আমার না।

সে যাকগে! হঠাৎ করে আমার মত পরিবর্তনের কারণটা নিয়ে একটু বলি। আপনাদের জয়ার কথা মনে আছে? সেই যে চট্টগ্রামের মিষ্টি মেয়েটা, যে কিনা শিক্ষিত এবং সাবলম্বী ছিল অথচ তাকেও সংসারধর্ম পালনে ব্যর্থ হয়ে নিজের জীবনকে বলি দিতে হয়েছিল। পুরো নেটদুনিয়া কদিন ধরে ওকে নিয়ে উত্তাল হয়ে ছিলো। সবার একই কথা- শিক্ষিতা, চাকরিজীবী হয়েও ওকে কেন সুইসাইড করতে হলো, কেন সে নিজের ছোট্ট বাচ্চার কথাও একটিবারের জন্য ভাবলো না। এ বিষয়ে আমার যে বক্তব্য সেটা আমি ফেসবুকে আমার মেয়েদের গ্রুপেই পোস্ট করতে পারতাম, কিন্তু সেদিন ব্যাবিলনের লিডারশিপ গ্রুপে একেএল–এর অপারেটর ইয়াসমিনের আত্মহত্যার খবরে আমার মনে হলো এ ব্যাপারে এখানেও কথা বলা দরকার।

দুটি ঘটনা দিয়ে শুরু করা যাক...

## ১

তুলির মনটা আজকে ভীষণ ভালো। আজ শফিকের বাড়ির লোকজন তাকে দেখতে আসবে, সব ঠিক থাকলে আজকেই বিয়ের পাকা কথা সেরে ফেলবে। তাদের দীর্ঘ চার বছরের সম্পর্ক পূর্ণতা পেতে যাচ্ছে, ভাবতেই ভালো লাগছে।
তুলি পড়ালেখা শেষ করে মাত্রই একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছে। ওরা দুইবোন, ও বড়ো। শফিকের সাথে ওর পরিচয় সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। শফিকও পড়া শেষে একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, তুলির তিন ব্যাচ সিনিয়র ছিল সে। এখনই বিয়ের কথা ভাবছিলো না তুলি, কিন্তু ওর বাবার চাকরি থেকে অবসর নেবার সময় হয়ে গেছে। অনেকটাই বাবার জোরাজুরিতে শফিকের কথা বাসায় জানায় ও।

শফিকের বাসা থেকে ওর বাবা-মা, ছোটোবোন আর এক মামা এসেছে।
শফিকের মা বললো– বাহ্ চা টা তো দারুণ হয়েছে, কে বানিয়েছে?
তুলির মা– আমাদের ঘরে চা তুলিই বানায়।

শফিকের মা– বেশ তো, তা শুধু চা ই বানাতে পারো নাকি আরো কিছু পারো?
তুলি– জি, আসলে রান্নাবান্না তো মা–ই সামলায়, আমি অফিস থেকে এসে খুব একটা সময় পাইনা এগুলো করার। তবে ছুটির দিনে একটা দুটা আইটেম করবার চেষ্টা করি।
– ওমা সেকি! বিয়ের পরে কি তাহলে আমার ছেলে না খেয়ে থাকবে?
– না না আপা, বিয়ের আগে আমিই বা কী এমন রাঁধতে পারতাম। ধীরে ধীরে সব শিখে যাবে, আপনি চিন্তা করবেন না।
– চিন্তা কি আর করি সাধে! আমার একটা মাত্র ছেলে, কত ইচ্ছে ছিল ঘরোয়া একটি মেয়ে দেখে ওর বিয়ে দেব। চাকরিবাকরি করা মেয়ে বাপু আমার পছন্দ না। আর তাছাড়া মেয়েরা চাকরি করলে সংসার সামলাবে কী করে। আমার ছেলের যা রোজগার, বিয়ের পরে তুলির কিন্তু চাকরি করবার দরকার পড়বে না।

তুলি ভীষণ অবাক হয়ে শফিকের দিকে তাকায়, আরো অবাক হয়ে যায় শফিকের অমন নির্লিপ্ততা দেখে। সেদিন সবাই মিলে ওদের বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে ফেলে, যদিও তুলির মন আর কিছুতেই সায় দিচ্ছিলো না। পরদিন সে অফিসের পরে শফিকের সাথে দেখা করে।

– শফিক, এমন কিন্তু কথা ছিল না। তোমাকে আমি শুরু থেকেই বলেছি আমরা দুইবোন, আমাদের কোনো ভাই নেই। বাবার অবসরের পরে আমাকে ওই সংসারের দায়িত্ব নিতে হবে। আর শুধু সেটাই না, আমি এতো কষ্ট করে পড়ালেখা করে নিজের ক্যারিয়ার শুরু করেছি। আজকে এককথায় আমি সবকিছু ত্যাগ করতে পারবো না। আমার পক্ষে এ বিয়ে করা সম্ভব না।

– আরে ধুর! তুমি এতো সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছো কেন? তুমি বরং এই চাকরিটা ছেড়ে বিসিএস এর প্রস্তুতি নাও। একটা সরকারি চাকরি পেলে তখন দেখো কেউ আর কিছু বলবে না। ততদিনে সংসারটাও গুছিয়ে নাও। আর তোমাদের বাড়ির কথা ভেবো না। তোমার বাবা পেনশনের টাকা দিয়ে কিছু একটা করবার চেষ্টা করুক। তাছাড়া আমি তো আছিই।

সেদিন শফিকের অমন কথায় অনেকটা আবেগের বসে বিয়েতে রাজি হয়ে যায় তুলি।

বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই তুলি বুঝতে পারে সে মস্ত বড়ো এক ভুল করে ফেলেছে। একেতো উঠতে বসতে সারাদিন শফিকের বাড়ির লোকের খোঁটা দেয়া, তারপরে শফিকের বদলে যাওয়া, মুহূর্তেই যেন তুলির জীবনটাকে নরক বানিয়ে দেয়। একদিন শফিক তুলিকে বলে,

– প্রাইভেট চাকরিতে খুব একটা উন্নতি নেই, ঠিক করেছি নিজের ব্যাবসা শুরু করবো। তোমার বাবাকে বলো আমাকে যেন কিছু টাকা দেয়।

– বাবা টাকা কোত্থেকে পাবে?

– কেন পেনশনের টাকা? সেগুলোতে তোমার কোনো অধিকার নেই? আর আমি যদি বিজনেসে ভালো করি তাতে তো তোমারই লাভ। নিজের মেয়ের জন্যে এটুকুও করতে পারবে না তোমার বাবা!

– আমি মরে গেলেও বাবাকে টাকার কথা বলতে পারবো না।

– ঠিক আছে তাহলে আমিই বলবো।

– তোমার কি একটুও লজ্জা করেনা শফিক? তুমি কী করে পারলে এই টাকার কথা মুখে আনতে? আমার ছোটো একটা বোন আছে, ওরও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে। আর বাবা মায়েরই বা চলবে কী করে!

– দ্যাখো এইসব ফালতু কথা বলে তুমি আমার মন গলাতে পারবে না। আমি আজই তোমার বাবাকে ফোন করে টাকার কথা বলবো।

সকালে তাড়াহুড়ায় ফোনটা বাসায় ফেলে বেরিয়ে যায় শফিক। হঠাৎ ফোনের স্ক্রিনে কিছু মেসেজ ভেসে ওঠে, তুলি না চাইতেও ওর চোখে পরে যায় সেগুলো। নীলা নামে শফিকের এক সহকর্মী একের পর এক মেসেজ করছে, সেগুলো পড়েই বোঝা যায় তাদের সম্পর্কের গভীরতা কতটুকু। তুলি যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারেনা। এই শফিককে কি সে আদৌ চেনে!

তুলি যখন ছলছল চোখে শফিকের ফোন হাতে দাঁড়িয়ে আছে, তখন শফিক ফোনটা নেবার জন্য বাসায় ফিরে আসে। তুলির হাতে ফোনটা দেখে সে সপাটে এক চড় বসিয়ে দেয় তুলির গালে।

– অন্যের ব্যক্তিগত জিনিসে হাত দিতে নেই জানোনা তুমি। এতো লেখাপড়া করে এটুকুও শেখোনি।

ফোনটা নিয়ে গটগট করে বাসা থেকে বেরিয়ে যায় সে।

তুলি ভাবে তার এখন কী করা উচিত! চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে! বাবার বাড়ি ফিরে গিয়ে সবকিছু খুলে বলবে ওদেরকে? বাবা মা কি পারবে এই বয়সে এতো বড়ো আঘাত সামলাতে? নাকি বলবে এই বদলে যাওয়া শফিকের সাথেই মানিয়ে নিতে। আসলে দোষতো তুলিরই! ভুল মানুষকে ভালোবেসেছিলো সে! তাই শাস্তিটা ওরই প্রাপ্য!

## ২

– কি ব্যাপার! বেলা ১০ টা বাজে, এখনো পরে পরে ঘুমাচ্ছো। আজকেও অফিস কামাই করবে নাকি?

কিছুক্ষণ পর শিহাব ফ্রেশ হয়ে নাস্তার টেবিলে আসলো।

– শিলা, তোমাকে আমার কিছু বলার ছিল।

– এখন না, আমার অফিসের দেরি হয়ে গেছে শিহাব। রাতে খাবার সময় শুনবো।

– তখন হয়তোবা আমার বলার মুড থাকবে না। আমি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।

– আবার! এই নিয়ে চারবার চাকরি ছাড়লে তুমি। তোমার সমস্যাটা কী বলতো?

– দ্যাখো তোমাকে তো আমি বলেইছি, আমার চাকরি করতে ভালো লাগে না। এইসব ছেড়ে আমি লেখালেখিতেই মন দিতে চাই। কটা বছর হয়তো একটু কষ্ট করতে হবে কিন্তু আমি একদিন খুব নাম করবো তুমি দেখে নিও!

– তাহলে আমাদের গাড়ি–ফ্ল্যাটের ইএমআই, ছেলের পড়ার খরচ, বছরে একবার বাইরে ঘুরতে যাওয়া, এসবের কী হবে?

– শিলা, তুমিতো চাকরি করছো, খুব ভালোও করছো। কয়েকটা বছর তুমি একটু সামলে নাওনা। আর কিছু বিলাসিতা বাদ দিলে ক্ষতি কী! তাছাড়া বাজারে আমার যেকটা বই আছে তার রয়্যালটি থেকেও তো কিছু আসে।

– শোনো শিহাব, এসব মধ্যবিত্ত চিন্তা–ভাবনা করে একটা আটপৌরে জীবন কাটিয়ে দেয়া হয়তো তোমার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু আমি পারবো না। আমি বাবা-মা, আত্মীয়স্বজনকে কী বলবো একবার ভেবে দেখেছো! সবাই বলবে তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বৌয়ের টাকায় চলছো।

– শুধু যদি তুমি পাশে থাকো, তাহলেই হবে। আত্মীয়স্বজন, পাড়া–প্রতিবেশীদের কথা আমার না ভাবলেও চলবে। তুমি ভুলে গেছো, কবছর আগে তুমিও তো চাকরি ছেড়ে দেশের বাইরে পড়তে গিয়েছিলে। শুভ্র তখন মাত্র নয় মাসের। আমিতো তখন চাকরি-সংসার সবই সামলেছি। তখনও সবাই অনেক কথাই বলেছিলো, কিন্তু তোমার মতো আমিও চেয়েছিলাম তুমি পড়াটা শেষ করো।

– দ্যাখো শিহাব, একটা মেয়ে কোনো চাকরি-বাকরি করুক বা না করুক তাতে কারো কিছু যায় আসে না, কিন্তু একটা ছেলে যদি বিয়ের পরে বেকার থাকে সেটা নিয়ে অনেক কথা হয়। আমার বেলায় কথা উঠেছিল শুভ্রকে রেখে যাওয়া নিয়ে, আমারও খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তুমিই ওকে নিয়ে যেতে দাওনি।

– সেটা তোমার ভালোর জন্যেই, নতুন জায়গায় কারো সাহায্য ছাড়া পড়া এবং বাচ্চা সামলানো, তোমার জন্যে কঠিন হতো। আর লোকের কথা বলছো, সে তুমি যা-ই করোনা কেন লোকে কিছু না কিছু বলবেই। তবে তোমার মুখে ছেলে-মেয়ের বিভেদ শুনে খুবই আহত

হলাম। তুমি যে সেমিনারে গিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা, নারী–পুরুষের সাম্য নিয়ে বড়ো বড়ো কথা বলে বেড়াও, সেগুলো আর বলোনা। যাদের বাইরে এক আর ভেতরে আরেক তাদেরকে ওসব মানায় না।

এবারে মূল বক্তব্যে ফিরি...
আচ্ছা মানুষ কেন আত্মহত্যা করে? চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় আত্মহত্যা করবার প্রবণতাকে বলা হয় এক ধরনের মানসিক ব্যাধি। বলা হয় খুব বেশিদিন ধরে অবসাদগ্রস্ত থাকা, কোনোপ্রকার মানসিক চাপে থাকা, পরিবারে কারো আত্মহত্যার হিস্ট্রি থাকা, বহুবছর ধরে অনিয়ন্ত্রিত আবেগ–অনুভূতি নিয়ে কঠিন সময় পার করা এবং এক পর্যায়ে গিয়ে সেটা অসহনীয় হয়ে ওঠা, খুব কাছের কারো মৃত্যু, অনেকদিন ধরে কঠিন কোনো রোগে ভোগা, নিজেকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা, ইত্যাদি কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে থাকে।

যদি আত্মহত্যা করবার প্রবণতার কথা বলি তাহলে বাংলাদেশ তথা সারাবিশ্বেই ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। তবে আত্মহত্যা করবার হারে কিন্তু ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে এগিয়ে আছে বিশ্বের অনেক দেশেই। যদিও বাংলাদেশে এক্ষেত্রেও মেয়েরাই এগিয়ে আছে। বাংলাদেশে যেসব ছেলেরা আত্মহত্যা করে তাদেরকে 'কাপুরুষ' বলে অনেকেই, মৃত্যুর পরেও অমন অপবাদ নিতে পারা যায়না, তাই হয়তো এদেশে ছেলেরা খুব সহজে আত্মহত্যার পথ মাড়াতে চায় না!

যাইহোক, বাংলাদেশে আত্মহত্যা করাটা যেহেতু অনেকটাই মেয়েদের ব্যাপার, তাই আমি উপরের দুটি ঘটনার বিবরণে আমাদের সমাজের দুটি ভিন্নধারার নারী–চরিত্রকে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করেছি। এখানে দুইটি চরিত্রের জায়গায় চারটিও হতে পারতো তবে সেক্ষেত্রে লেখাটা অনেক বড়ো হয়ে যেত।

প্রথম গল্পের কথা বলি– আমাদের দেশে এখনো 'কনে দেখা' র মতো বিকৃত একটি রীতি বিদ্যমান। যেখানে ছেলেপক্ষ সদলবলে তাদের সুযোগ্য (!) পাত্রের জন্য পাত্রী দেখতে যায়; সেখানে পাত্রীপক্ষের আতিথেয়তার ভুল ধরে, তাদের টাকায় উদরপূর্তি করে, তাদেরকে পদে পদে অপদস্থ করে, তাদের কন্যাসন্তানকে যাচাই–বাছাই করা হয় – ঠিক যেমনভাবে আমরা বাজার থেকে পণ্য কিনি। ওই গল্পের শফিক এবং তার পরিবারের দোষ দেবার আগে আমি বলবো তুলি এবং তার বাবা–মায়ের কথা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ছেলেপক্ষের সকল অন্যায় আবদার মেয়েপক্ষ চুপচাপ মেনে নেয়, পরবর্তীতে যার ফল ভোগ করতে হয় তাদের মেয়েটিকে। আমি বলি কি, সন্তানকে কেবল শিক্ষিত এবং সাবলম্বী করলেই হবে না, তাকে তার

জীবনের সিদ্ধান্ত নিতেও শেখাতে হবে, সেই সিদ্ধান্তে তার পাশেও থাকতে হবে।

আজকের দিনে নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যে যুদ্ধে নেমেছে, সেখানে আমাদের দেশের নারীরা ঘরের বাইরের কাজে অসামান্য অবদান রাখতে শুরু করলেও ঘরের কাজে পুরুষেরা ঠিক সেই অর্থে অবদান রাখতে পারছে কি? এই যে আজকে পুরুষেরা ঘরের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারলো না অথবা শিখলো না, যার কারণে নারীদের কাঁধে সংসারের বোঝার পাশাপাশি বাইরের কাজের বোঝাও যোগ হলো, তার দায়ভারও কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্য একজন নারীর–ই। কারণ, আমরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এটাই দেখে এসেছি যে ছেলেরা ঘরের কাজ পারবে না অথবা করবে না। আমার নিজের মা–চাচীদেরই দেখেছি, তারা বাবা–চাচাদের গৃহকর্মে অনিপুণ হওয়া নিয়ে কত আক্ষেপ করতেন। অথচ কী পরম যতনে তারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ঠিক একই রকম সমস্যা তৈরি করে গেছেন। চলুন এই ধারা পরিবর্তন করি। আমাদের সন্তানদেরকে তাদরে বয়স অনুযায়ী ঘরের এবং বাইরের–দুই কাজেই অংশগ্রহণে উৎসাহিত করি।

অপরদিকে, নারীর ক্ষমতায়নের এই যুগে আমরা যেমন অনেক নারীকেই দেখি পরিবারের দুর্দিনে পরিবারের হাল ধরতে, পরিবারের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনে অসামান্য অবদান রাখতে। ঠিক তেমনি আমরা শিলার মতো মেয়েদেরও দেখি যারা নিজেদেরকে সাবলম্বী ভাবে ঠিকই কিন্তু কোনো দায়িত্ব নেবার বেলায় সেটাকে এড়িয়ে যাওয়াটাই বাঞ্চনীয় মনে করে। আমরা যদি বিশ্বাস করি স্বামীর উপার্জিত টাকাও আমাদের টাকা আবার আমাদের উপার্জিত টাকাও আমাদের টাকা, তাহলে আমি বলবো আমাদের উচিত 'নারীর ক্ষমতায়ন' নিয়ে একটু পড়ালেখা করা। উপরের দুটি ক্ষেত্রেই আমি প্রিয় সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদের একটি উক্তি উল্লেখ করতে চাই –

"পুরুষতন্ত্রের চেয়ে পুরুষতন্ত্রে দীক্ষিত নারী, নারীর জন্য বেশি ভয়ংকর।"

আমরা বাঙালি মেয়েরা আদতে ভীষণ অদ্ভুত, আমরা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি অন্যের জন্যে বাঁচি। আমাদের সুখ–দুঃখ–ভালোলাগা–মন্দলাগা সবই অন্য কাউকে ঘিরে থাকে। কিন্তু যখন আমরা দেখি যাদেরকে ঘিরে আমাদের পৃথিবী একসময় আবর্তিত হতো তারা সবাই একে একে হারিয়ে গেছে, তখন আমরা কোথাও নিজেদেরকে আর খুঁজে পাইনা। তখন এক অদ্ভুত হাহাকার এসে গ্রাস করে আমাদেরকে, বেঁচে থাকাটা ভীষণ অর্থহীন মনেহয়।

আমি নারী–পুরুষের সমান অধিকার বিষয়ক তর্ক–বিতর্ক করতে আসিনি, বস্তুত আমি মনেকরি এই বিষয়ে কোনো তর্ক হতেই পারে না। অবশ্যই নারী এবং পুরুষ আলাদা, এবং যে যার যার জায়গায় মহীয়ান। এই পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষায় দুজনেরই সমান

অবদান রয়েছে। তবে বিপত্তিটা বাধে তখন যখন একদল বলে যে তারা অন্য দলের চেয়ে উত্তম।

সামাজিক অথবা মানসিক চাপে যেসব মেয়েরা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে, বেঁচে থাকবার কোনো কারণ খুঁজে পায়না, তাদের উদ্দেশে আমি কিছু কথা বলতে চাই, আর সেজন্যেই এই লেখাটি –

মেয়ে, তুমি অবশ্যই অন্যকে ভালোবাসবে, বাবা–মা–স্বামী–সন্তানকে স্নেহডোরে বাঁধবে, সেটাই তোমার শক্তি, সেখানেই তুমি অনন্যা। তবে সবার আগে তুমি নিজেকে ভালোবাসতে শেখো, নিজের জন্যে বাঁচতে শেখো, তাহলেই অন্যের প্রতি তোমার যে ভালোবাসা সেটা তোমার দুর্বলতা না হয়ে শক্তিতে পরিণত হবে। কেউ তোমাকে অপমান করেছে? তুমি তোমাকে সম্মান করো। ভীষণ সমস্যায় পড়েছো? চিন্তা করোনা সব সমস্যারই একসময় সমাধান হয়। কেউ তোমাকে ভালোবাসেনি? অসুবিধা কি, তুমি তোমাকে এতটা ভালোবাসো যাতে করে অন্য কেউ তোমাকে ভালোবাসলো কিনা তাতে তোমার কিছুই না এসে যায়। কেউ তোমাকে ঠকিয়েছে? তুমি তোমাকে ঠকাচ্ছো না তো? সমাজ তোমাকে মেনে নিচ্ছে না? কিন্তু তুমিতো তোমাকে মানো, তাইনা? আর সমাজের কথা বলতে গেলে সেই জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া মিম্‌সের কথাই বলতে হয়– "ভাবছো লোকে কী বলবে? লোকে তোমার কুলখানিতে এসে বলবে তরকারিতে লবণ কম হয়েছে।" সবার আগে তুমি নিজে নিজেকে মানুষ ভাবতে শেখো, ভালো মানুষ হবার জন্য যে সকল গুণাবলী থাকা আবশ্যক সে সকল গুণাবলী নিজের ভেতরে ধারণ করো, তারপরে তো এই সমাজ আর তার মানুষেরা তোমাকে মানুষ হিসেবে গ্রহণ করবে। বিশ্বাস করো, তুমি যখন আত্মহত্যা করবে, এই পৃথিবীর কারোই কিছু যাবে আসবে না। দুদিন পরে সবাই সবকিছু ভুলে যাবে। একটাই তো জীবন, তাকে এভাবে নষ্ট করবার কী মানে হয়!

# ক্ষণজন্মা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী

ডা. সুতপা ইসলাম
প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

ইতিহাস মানুষই তৈরি করে, তবে কোনও কোনও ব্যক্তি ইতিহাসের খাত কাটেন, পথ গড়ে দেন। এভাবে হয়ে ওঠেন পথিকৃৎ বা দিশারি। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের তেমন এক কান্ডারি - ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, জাতীয় ঔষধনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন তার উদ্যোগ। তার অর্জনের মাইল ফলকগুলো চেনা যায়, তবুও অগোচরে রয়ে যায় তার অনেক অবদান।

জাফরুল্লাহ চৌধুরী, জন্ম ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪১, চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায়। তার বাবার শিক্ষক ছিলেন বিপ্লবী মাষ্টার দা সূর্যসেন। পিতামাতার দশজন সন্তানের মধ্যে তিনি সবার বড়ো। ঢাকার বকশীবাজারের নবকুমার স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট উত্তীর্ণের পর তিনি ১৯৬৪ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. এবং ১৯৬৭ সালে বিলেতের রয়েল কলেজ অব সার্জনস থেকে এফআরসিএস প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ক্রান্তিকালেই চেনা যায়, কে বন্ধু, কে শত্রু। ১৯৭১ এ দেশের ক্রান্তিকালে বিলেতের বিলাসী জীবন, সর্বোচ্চ উচ্চতর ডিগ্রির সুযোগ ছিঁড়ে ফেলে তিনি ঝাপিয়ে পড়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের নিমিত্তে ভারতে ফিরে গেরিলা প্রশিক্ষণ নেন। এরপরে ডা. এম.এ মবিনকে সাথে করে রণাঙ্গনের পেছনে প্রতিষ্ঠা করেন মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ৪৮০ শয্যাবিশিষ্ট বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল। তিনি সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেক নারীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যজ্ঞান দান করেন। যা দিয়ে তারা রোগীদের সেবা করতেন এবং তার এই অভূতপূর্ব সেবা পদ্ধতি বিশ্ববিখ্যাত জার্নাল পেপার ল্যানসেট-এ প্রকাশিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধ শেষ, দেশ স্বাধীন হলো। কিন্তু তিনি থেমে যাননি। তিনি গণস্বাস্থ্য নামে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাস থেকে কিছু চিকিৎসক ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছে তাবুতে বাস করছিলেন। জাফরুল্লাহ চৌধুরী হয়তো প্রথম ব্যক্তি, যিনি গ্রামের ধাত্রী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সাইকেল চালানোর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। সাভারে তার প্রতিষ্ঠিত গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এখন পর্যন্ত তা অত্র

এলাকার মানুষের বিশ্বাস ও ভরসাস্থল। তিনি শুধু মানুষের স্বাস্থ্য নিয়েই সচেতন ছিলেন এমন নয়, যেকোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে তিনি ঢাল হয়ে দেশের বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময়, কেন্দ্রের একাধিক গ্যাসের চুলায় দিন রাত খাবার রান্না করে বন্যাকবলিত এলাকায় পাঠিয়েছেন। ১৯৯১ সালে প্রলয়ংকরী ঘুর্ণিঝড়ের পরেও তিনি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

ডা. জাফরুল্লাহ তাঁর প্রেরণাদায়ী প্রজ্ঞার কী সৃষ্টি করেছেন, তা অনুধাবন করতে গেলে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং এর বিভিন্ন দিক অনুধাবন জরুরি। এছাড়া তার অবদানের মধ্যে স্বাস্থ্যবীমা, ওষধি গাছ নিয়ে গবেষণা, জৈব খাদ্য উৎপাদন, পাখি ও বনায়ন, গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ, গণবিশ্ববিদ্যালয় এবং গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যালস -এর কথা বলতেই হবে। আমি নিজে এই গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হতে পাশকৃত একজন গর্বিত ছাত্রী। তার বিশেষ কিছু কাজের মধ্যে অন্যতম হলো, শতশত নারীকে তিনি এমন কাজে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন যা কেবল পুরুষের কাজ হিসেবে বিগণিত হয়। আমি স্বচোখে দেখেছি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কাজ করতে নারী ছুতার, নারী মেশিনচালক, নারী ঢালাইকর্মী, নারী গাড়ীচালক, এবং নারী দারোয়ান - দেরকে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে তার অবদান অপরিসীম, স্বল্প খরচে মেডিকেল কলেজে পড়তে পারা, স্বল্প খরচে সকল জটিল রোগের চিকিৎসা পত্র, অপারেশন, ঔষধ বিতরণ- তাঁর প্রতিষ্ঠিত গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজেই সম্ভব। তাঁর প্রতিষ্ঠিত গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে স্বল্প খরচে ডায়ালাইসিস ও কিডনি রোগের চিকিৎসা সম্ভব। দেশের কিডনি রোগীদের ভরসার স্থান, ঢাকার ধানমণ্ডিতে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ধারণা এখন প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারিবিদ্যায় গভীর বিদ্যা ছাড়াও সাধারণের জন্য প্যারামেডিক হওয়ার সুযোগ। তার এই দুটি ধারণা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতিসংঘ ছাড়াও অনেক উন্নত দেশ গ্রহণ করেছে।

জীবনের সায়াহ্নকালে বসে বাংলাদেশসহ পুরো বিশ্বই যখন Covid19 অতিমারির

ভয়াল থাবার নিচে, সে সময় তিনি আবার দাঁড়ালেন, করোনা ভাইরাস পরীক্ষা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের গবেষণা কাজে।

কী সততায়, কী নির্লোভ জীবনযাপনে, কী চরিত্রের সাহসিকতায় এবং কী দুস্থদের প্রতি পিতৃসুলভ ভালোবাসায়; ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এমন এক মনুষ্য প্রতিমা, যা আমাদের যুগে বিরল। এই অর্থেই তিনি ক্ষণজন্মা, এই অর্থেই তার উদ্দেশে বলা যায়- এই পৃথিবী একবার পায় তারে, পায়না-কো বারবার।

এমন কর্মবীর মানুষেরা কাজ করেন একা, সকলের জন্য। আজীবন তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন তাঁর স্বমহিমায়।

# চাষা

মো. রিমন আলী
অপারেটর, সুইং
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

খাদ্য অভাব ঘুচায় মোদের
জোগায় অন্ন দানা,
তাদের শ্রমে ফসল ফলে
আছে মোদের জানা।
রোদ দুপুরে খাটেন তারা
ফসল ফলে যাতে,
সেই ফসল গিয়ে বেচেন
বাড়ির পাশের হাটে।
স্বপ্ন নিয়ে করেন বপন
ধান গম কি পাট,
ঝড় তুফানে ফসলের ক্ষতি
চাষার মাথায় হাত।
শত কষ্টের পরেও চাষা
আজও চলছে হেঁটে,
সোনার ফসল ফলায় তারা
রোদ দুপুরে খেটে।

# “999” এর সেবা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা

প্রদীপ কুমার দত্ত
প্রাক্তন ডিজিএম
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

কবিগুরুর লেখা “আত্মত্রাণ” কবিতার দুই লাইন “বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়।” যা ইংরেজিতে লিখলে হবে- “Save me from danger is not my prayer, In face of danger may I not fear.” দ্বিতীয় লাইনটি খুবই জরুরি কয়টি কথা। জীবনে কেউ কখনও কোনো বিপদে পড়লে, ভয় পেতে নেই। ভয় পেলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রায়শই আমরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলি, তাতে বিপদে আরও বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই বিপদ যত বড়োই হোক- শান্ত থাকতে হবে, ধৈর্য্য ধরতে হবে-

“সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে”- এমন এক বিপদের মধ্যে পড়ে আমি এক অভিজ্ঞতার সফল অভিযানের কাহিনী আজ পাঠকদের উদ্দেশে নিবেদন করছি-

এমন এক অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদে পড়েছিলাম আমি নিজেই। কিন্তু, কিভাবে সে বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম, তাই শুনুন। আগস্ট ৫ তারিখ, ২০২৩ সাল। সন্ধ্যা ৬:৪০ মিনিটের সময় আমি লিফটে চড়ে একটি বহুতল ভবনের প্রত্যাশিত চার তলায় পৌঁছে গেছি। লিফট যথারীতি থামলো, আরোহী আমি একা। কিন্তু, লিফটের দরজা খুলছে না। কী করি? উপায় কী? লিফটের ফাঁক দিয়ে বাইরের অবস্থান অস্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু, কাউকে চোখে পড়ছে না। সমূহ বিপদ আঁচ করতে পেরে মনে মনে সাহস সঞ্চার করার কথা একটু ভাবলাম। এটা একটা প্রাইভেট বহুতল ভবন কী হাসপাতাল। নিজেকে বড্ড অসহায় মনে হতে লাগলো। জোরে জোরে ডাকাডাকি শুরু করলাম, এ ভেবে যে যদি কারও কোনো সাড়া মেলে। চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে বলতে লাগলাম- কেউ কি আছেন? আমি লিফটে আটকা পড়েছি। একজন বাইরে থেকে লিফটের কাছে এগিয়ে এলেন। আমি তাঁকে ভিতর থেকে লিফটম্যানকে ডেকে আনার জন্য অনুরোধ করলাম। কিন্তু এদিক সেদিক তাকিয়ে বললেন যে - এখানে কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। তাঁকে আবারও ভিতর থেকে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ জানালাম, ভবনের নিচে বা উপরের ফ্লোরে যদি কাউকে পান, তাহলে ডেকে নিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ পর ঐ ভদ্রলোক ফিরে এসে জানালেন যে লিফটম্যান নিচে থেকে লিফট খোলার জন্য চেষ্টা করছে। এ কথা শুনে একটু স্বস্তিবোধ করলাম।

মাঝে মাঝে লিফটের ভিতর বাতি জ্বলে উঠে, আবার নিভে যায়। কিন্তু লিফটের দরজা আর খুলেই না। এখানে উল্লেখ করা দরকার- আমি লিফটে চড়েই '৪' - (চার) নম্বর বাটন খোঁজ করছিলাম, বাটনের প্যানেল বোর্ডে। কিন্তু, দেখলাম ঐ বাটনটি কাগজ সেঁটে ঢেকে রাখা হয়েছে। আমি বাটনের নম্বরগুলোর ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী গুনে, '৪' নম্বর বাটন অনুমানে বুঝতে পেরে, ওটাতেই টিপ দেই। সাথে সাথে লিফটটি উপরে উঠতে শুরু করে। কিন্তু, পরক্ষণেই খেয়াল করি, বাটনটি ঢেকে রাখা কাগজটিতে ইংরেজিতে একটি সতর্কবাণী লেখা রয়েছে - "Don't touch"। ততক্ষণে আমি বাটন পুশ করে প্রায় যথাস্থানে পৌঁছে গেছি। আর মনে মনে ভাবছি- কাগজটিতে সতর্কবাণী লেখা রয়েছে, অথচ আমিতো প্রায় পৌঁছেই গেছি। সেজন্য মনে মনে খুশিই হয়েছিলাম। কিন্তু বিধি বাম। লিফট থেমে গেছে কিন্তু খুলছে না। কিছুক্ষণ লিফটম্যান উপরে এসে আমাকে বাহিরে থেকে লিফটটি খোলার জন্য বিভিন্ন রকম নির্দেশনামূলক পরামর্শ দিতে লাগলেন। উনার নির্দেশমত আমি ভিতর থেকে চেষ্টা করলাম। কিন্তু, কোনও নির্দেশনাই বাস্তবে ফলপ্রসূ হচ্ছে না। নিরুপায় হয়ে আমি ভিতর থেকে লিফটম্যানের ইন্টারভিউ নেওয়া শুরু করে দিই। তার লিফট চালনায় অভিজ্ঞতা কতটুকু। মেকানিকেল ফল্ট হলে, সে সারাতে জানে কিনা। আটকে গেলে এর আগে কখনো এমন খোলার অভিজ্ঞতা আছে কিনা? উত্তরে সে জানালো, তাঁর এ ব্যাপারে কোনো প্রশিক্ষণ বা পূর্ব অভিজ্ঞতা নাই। বুঝা গেল সে এ ব্যাপারে খুবই কাঁচা। তখনও সে বাইরে থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় খোলার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু খুলতে না পেরে, তাকে কিছুটা নার্ভাস দেখাচ্ছে।

আমি তখন তার উপর ভরসা না করে হাতের মোবাইলে "999" (ট্রিপল নাইনে) চাপ দিলাম। অন্য প্রান্ত থেকে তাৎক্ষণিক সাড়া মিললো। তারা আমার অবস্থান এবং প্রয়োজন সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তাদেরকে জানালাম যে আমি লিফটে আটকা পড়েছি। আমাকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করার জন্য তাদেরকে বিনীত অনুরোধ করলাম। তারা আমার অবস্থান জানতে চাইলে, আমি আমার

অবস্থান সম্পর্কে জানালাম। কমলাপুর ষ্টেশন থেকে একটু দূরে বৌদ্ধ মন্দিরের নিকট একটি হাসপাতালের বহুতল ভবনের মাঝপথে লিফটের ভিতর আটকে আছি- এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত ঠিকানা জানালাম। জানতে চাইলো এটা কোন থানায়? সবুজবাগ থানার অন্তর্গত কি? আমি আমার জানামতে 'হ্যাঁ' বললাম। তাঁরা আমাকে আশ্বস্ত করে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে পরামর্শ দেন। সাথে সাথে এটাও জানালেন যে আমরা সবুজবাগ থানার ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিচ্ছি তারা এক্ষুণি আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। কিছুক্ষণ পর আরেকটা কল পেলাম সবুজবাগ থানার ফায়ার সার্ভিস অফিস থেকে। তারাও ঘটনা এবং আমার অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিলেন। ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করার জন্য বললেন। আমি অপেক্ষা করে আছি। কিন্তু অপেক্ষার প্রহর সহজে ফুরায় না। ইতোমধ্যে আর একটা ফোন কল পেলাম। কল ধরার আগেই মনে মনে ভাবলাম- কলটা হয়তো ফায়ার সার্ভিস থেকেই এসেছে, হয়তো উদ্ধারকারী টিম এতক্ষণে পৌঁছে আমাকে সনাক্ত করতে কল দিয়েছে। মনে স্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু না, ফোন কলটা ফায়ার সার্ভিসের নয়। কলটা ছিল- আমার স্ত্রীর। সে জানতে চাইলো- আমি এ মাসের ইন্টারনেটের বিল পেমেন্ট দিয়েছি কিনা। দেই নাই, জানালাম। মাসকাবারি বিল আদায়ের জন্য আদায়কারী বাসায় এসেছে। আমি তাকে টাকা প্রদান করে রশিদ গ্রহণ করার জন্য বলে দিলাম। আমাদের প্রয়োজনীয় কথা শেষ হয়ে গেলো। আমার স্ত্রী অপর প্রান্ত থেকে কল রেখে দিলো। আমি লিফটে আটকা পড়ে আছি, এ ব্যাপারে তাকে কিছুই বলিনি।

এর কিছু পর ফায়ার সার্ভিস থেকে ছয়জনের একটি চৌকশ উদ্ধারকারীদল উপরে উঠে এলেন। তখনও পর্যন্ত লিফটম্যান তার সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে- লিফটিকে খোলার জন্য, কিন্তু, সকল চেষ্টাই তার ব্যর্থ হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের লোকজন ঐ লিফটম্যানকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন সে লিফটখানা সফলভাবে খুলে আমাকে বের করতে পারবে কিনা? লিফটম্যান এ প্রশ্নের জবাবে নিরুত্তর ছিলেন। আমি নিজেই ভিতর থেকে ফায়ার সার্ভিসের লোকজনদেরকে অনুরোধ জানালাম তাদের পেশাগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অপারেশন শুরু করবার জন্য। তারা আমার অনুরোধে সাড়া দিয়ে সাথে সাথে কাজ শুরু করেন। তাদের সাথে আনিত আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্রুত সংযোজন করে যন্ত্রের এক প্রান্ত লিফটের ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করিয়ে ধরে আস্তে আস্তে লিফটের দরজার দুই পাল্লায় চাপ দিতে থাকেন। বাইরে থেকে নিউমেটিক কম্প্রেসার যন্ত্রের সংযোগের মাধ্যমে চাপ জেনারেট করা হয়। চাপের ফলে দরজার পাল্লা দুটো দুই দিকে সরে যায়, ফাঁকের আকার বড়ো হয়। এমতাবস্থায় আমার হাতের

কব্জিতে ধরে একজন উদ্ধারকারী আমাকে লিফটের ভিতর থেকে টেনে বের করে আনেন। আমিও তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসার জন্য উতলা হয়েই ছিলাম। তবে সারাক্ষণ সুস্থ স্বাভাবিক ছিলাম। একজন এগিয়ে এসে আমাকে ধরলেন, বুকে হাত রেখে জানতে চাইলেন, আমি কেমন বোধ করছি? কোন কষ্ট আছে কিনা? আমি দৃঢ়তার সাথে জানালাম "আমি ভালই আছি, সুস্থ স্বাভাবিক আছি। আমার জন্য কোন রকম দুশ্চিন্তা করবেন না।" আমার সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থা দেখে তারাও আশ্বস্ত বোধ করলেন।

তবে বের হওয়ার পরপরই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উপর বেজায় ক্ষেপে যাই। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কেউ নিজেরা আমাকে উদ্ধার করার কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নাই। এমনকি আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনতো দূরের কথা, কোনও রকম খোঁজ নিতে কেউই এগিয়ে আসেনি।

যাই হোক এবার অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু কথা বলি- বিপদ কখনও বলে কয়ে আসে না। তবে বিপদে পড়লে, ঠান্ডা মাথায়, কী করতে হবে সে বিষয়ে উপায় স্থির করতে হয়। আমার নিকট মোবাইল ফোন ছিল। বিপদের সময় এটাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, সেটা ভাবা যেতে পারে। কারণ বর্তমানে মোবাইল ফোন খুবই দরকারি কাজে ব্যবহার করা যায়। তাই বাইরে বেরুবার সময়, মোবাইল ফোন সাথে থাকা জরুরি। মনে রাখতে হবে- শুধু ফোন থাকলেই চলবে না, এতে পর্যাপ্ত কল চার্জের টাকা এবং পাওয়ার চার্জ ফিল আপ করে রাখতে হবে। কোথাও বের হওয়ার আগে এগুলো ঠিক আছে কিনা নিয়মিত চেক করতে হবে।

যদি কখনও কেউ কোথাও আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হন, তবে বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য "999" (ট্রিপল নাইন)-এ কল দিয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য চাইতে পারবেন। এটা খুবই কার্যকরী একটি জাতীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান। তবে কৌতূহলবশত কোন ফেইক কল দেওয়া যাবে না। "999" -এর জরুরি সেবা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা সকলেরই দরকার। আমি মনে করি, এ সম্পর্কে স্কুলের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে একটি অধ্যায় থাকা আবশ্যক।

জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি বিশেষ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান। "999" -এর সেবার মান অনন্য উৎকর্ষতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে চলেছে নিরন্তর। উত্তরোত্তর এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি। "999" -এর সেবা বাংলাদেশে প্রথম প্রবর্তিত হয় ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। এটি একটি জাতীয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ হটলাইন সার্ভিস। কোন রকম সার্ভিস চার্জ ছাড়াই সকলের জন্য উন্মুক্ত। শুধু গ্রহণযোগ্য কোন বিপদজনক ঘটনা

ঘটলেই বা বিপদ হওয়ার মতো আশঙ্কা দেখা দিলেই এ সেবা পাওয়া যেতে পারে। পুলিশ, ফায়ার, এম্বুলেন্সের মতো জরুরি প্রয়োজনসমূহ এ সেবার আওতাভুক্ত। "999" -নম্বরটা নির্ধারণ করাই হয়েছে যাতে সহজেই মনে রাখা যায় এবং প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করা যায় এমনভাবে।

অনাবশ্যক এ নম্বরে ডায়াল করা আইনগতভাবে নিষেধ আছে। তাই পরীক্ষামূলক বা কৌতূহলী হয়ে এ নম্বরে ডায়াল করতে নেই।

আমি প্রায় ৪৫ মিনিট লিফটের ভিতর ছিলাম। স্বল্প সময়ের মধ্যেই আমি উদ্ধার পেয়েছি একমাত্র "999" -এর সক্রিয় সহযোগিতায়।

# কোভিডের দিনগুলি

সোহেলী সুরাইয়া ছাদেক
ডেপুটি ম্যানেজার, সেলস অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

আজ আমি ২০২০ এর কথা বলছি না, বলছিনা অনিশ্চয়তা আর আতঙ্কের সেই দিনগুলোর কথা। এটা কোভিড ভ্যাকসিনের আগের সময়টাও নয়। আমার কোভিড হয়েছিল ২০২১ সালে, যখন এটা মোটামুটি সাধারণ সর্দি-কাশির কাতারে নামার পথে প্রায়। গা ব্যাথা আর জ্বর সহ মুখে মাস্ক দিয়ে অফিস করার ৩য় দিনে কোভিড টেস্ট দিয়ে হোমঅফিস করা শুরু করি। সেদিন বিকেলেই মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে কোভিড-১৯ পজিটিভ রিপোর্ট পাই। যদিও কোভিড-১৯ তখন অতটা ভয়ের বিষয় নয়, তবুও মা ও আমার মেয়ের কথা ভেবে ভয় লাগছিল। তারা দুইজনই আমার সাথে সাথেই ছিল এই কয়দিন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ছাড়া পরিবারের অন্য কেউ অসুস্থ হয়নি। সেদিন থেকেই আমি কোয়ারেন্টিন-এ গেলাম (নিয়ম, তাই গেলাম, যদিও জানিনা এখন থেকে কী হবে) দরজা বন্ধ করে বাড়ির একটা রুমে থাকা শুরু করলাম। ১ম রাতে মেয়ে আমাকে একটা চিঠি দিল দরজার নিচ দিয়ে। যেন আমি চিঠিটা ধরে ঘুমাতে পারি রাতে। আমি অফিস, আত্মীয় ও বন্ধুদের জানিয়ে দিলাম আমার অসুস্থতার কথা। প্রায় সবাই ফোন করে খোঁজ খবর নিল। সবার মধ্যে একজন স্পেশাল। আমার মেজ চাচা। উনি রোজ সকালে একবার ফোন করে ভালোমন্দ খোঁজ নেন। বলা যায় – সকাল বেলা চাচার ফোন দিয়ে আমার দিন শুরু হয়। কোভিড-১৯ আমার উপর খুব একটা কঠিন ছিল না, আলহামদুলিল্লাহ। আমার ছিল দুর্বলতা আর গা ব্যাথা– ব্যস। প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করে প্রথম কাজ– ঘর, বারান্দা, বাথরুম স্যাভলন দিয়ে মুছে ফেলা। তারপর বারান্দায় বালিশ, বিছানা রোদে দেয়া – ব্যস আমার কাজ শেষ। এখন সারাদিন শুধু ল্যাপটপ নিয়ে অফিসের কাজ করা, খাওয়া, নামায, মাঝেমাঝে দরজা খুলে দূরে বসে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলা। ল্যাপটপ, মোবাইল, হোয়াটসঅ্যাপ – এই জিনিসগুলো আমাদের কাজ কত যে সহজ করে দিয়েছে! আমাদের যোগাযোগ হয়ে গেছে অনেক সহজ। হোমঅফিস শুরু করে আমি খুব ভালো বোধ করতে লাগলাম। সবাই অফিসে ঢোকার আগেই আমার কাজ প্রায় ৫০% শেষ। এক সপ্তাহ পর পুনরায় কোভিড টেস্ট এর জন্য গেলাম, কারণ পুনরায় অফিসে যোগদানের জন্য

নেগেটিভ রিপোর্ট প্রয়োজন। অনেকদিন পর বাইরে বের হয়ে কিছুটা দুর্বল লাগছিল। চাচার সাথে সেদিন সকালে কথা হয়নি। চাচা জানতেন, আমি পরীক্ষা করাতে যাবো। সেখানে অনেক লম্বা লাইন ছিলো। সব কাজ শেষ করতে দুপুর হয়ে গেল। বাসায় ফিরে ফ্রেশ হওয়া, খাওয়া - নামায – সব মিলিয়ে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। মাগরিবের নামায আদায় করে তাই ঘুমিয়ে গেলাম। মোবাইলের শব্দে ঘুম ভাঙলো। মেজচাচা ফোন দিয়েছে। ফোন ধরতে ধরতে কেটে গেল। কাঁচা ঘুম, ক্লান্তি সব কিছু মিলিয়ে ফোন ব্যাক করার মত শক্তি পাচ্ছিলাম না। ভাবলাম থাক, পরে কথা বলব। তারপর আবার চিন্তা বাতিল করে ফোন দিলাম – চাচাকে জানালাম – শরীরটা আজ খুব দুর্বল। এছাড়া ভাল আছি। পরদিন অফিসের কাজে বেশ ব্যস্ত সময় কাটল। কথা হলোনা চাচার সাথে। তার পরদিন সকালে যথারীতি চাচার মোবাইল থেকে ফোন, রিসিভ করে সালাম দিলাম – ওপাশ থেকে নীরবতা। বোঝার চেষ্টা করলাম। মনে হল চাপা একটা কান্নার মতো আওয়াজ – কণ্ঠটা আমার বড়ো বোনের (কাজিন)। আমার হৃৎপিণ্ড ঠান্ডা হয়ে গেল – না বলা কথাগুলো কে যেন কানে কানে বলে দিল– চাচা আর নেই! চাচা–চাচি রোজ ফজরের নামাজ আদায় করেন। তারপর কুরআন তেলাওয়াত করেন, এরপর একসাথে চা পান করেন। ওইদিনটাও এমনই ছিল। ফজরের নামাজের পর – চাচা সোফায় বসে কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন, চাচি গিয়েছিলেন চা বানাতে। ফিরে এসে দেখেন চাচা – সোফায় বসে, কোরআন কোলে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। চাচি বলেন, "আল্লাহ, তুমি কোরআন টেবিলে রেখে তারপর ঘুমাবে না," বলতে বলতে কোরআন সরিয়ে রেখে চাচাকে ডাকতে গেলেন। দেখেন উনি নেই। চাচা ছিলেন খুব সাধারণ একজন মানুষ। তেমন কোন চাওয়া–পাওয়া ছিল না। সবার সাথে হাসি–ঠাট্টার মধুর একটা সম্পর্ক রাখতেন। তার চলে যাওয়াটাও বুঝি তাই হল– খুব সাধারণ, শান্তির। এমনভাবেও চলে যাওয়া যায়! সেই রাতেই চাচার সাথে ছিল আমার শেষ কথা পরের ফোনটা ঠিক সময়েই এসেছিল আমার মোবাইলে, কিন্তু মানুষটা ছিল না! চাচা মসজিদে যেতেন নামায আদায় করতে, বয়স হয়ে গিয়েছে – আমরা তাই বলতাম বাড়িতেই আদায় করার জন্য, ভয় পেতাম করোনা নিয়ে। চলেই গেলেন, কিন্তু করোনায় নয়– সময় হয়ে গিয়েছিলো– তাই! মোবাইলের কল হিস্ট্রি মনে করিয়ে দিতো তার নিয়ম করে প্রতিদিন খোঁজ নেয়ার কথা। সেই নাম্বারে সবাই আছে, চাচা নেই।

# ব্যাবিলন-ভোরের গল্প

গোলাম মোরশেদ
প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক

১৯৮৫ সালের এক সাদামাটা সকাল বেলা। নাস্তা সেরে বারান্দায় রোদ লাগাচ্ছি গায়ে। মেইন গেইটে টক্ টক্ শব্দে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, আরিফ এসেছে। আমার স্কুল বন্ধু। ক্লাস ফোর থেকে এক সাথে পড়েছি। কাছাকাছি বাসা থাকার কারণে এক সাথে বড় হয়েছি কলেজ-কাল পর্যন্ত। সেই সময়ে সে লন্ডন চলে গেলো। অনেক বছর পরে দেখা হলেও মনে হতো না, অনেকদিন পর দেখছি।

আরিফ কোন ভূমিকা না রেখেই বললোঃ বন্ধু, তোর কাছে একটা ব্যবসায়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। তুই রাজি থাকলে এক সাথে করতে চাই। বললো, বাংলাদেশ থেকে গার্মেন্টস রফতানী শুরু হয়েছে ক'বছর ধরে এবং এর ভবিষ্যৎ খুব ভাল। আমি তখন অন্য ক্ষেত্রের একজন নবীন গন্ধমাখা ব্যবসায়ী। সিঙ্গাপুর ও হংকং-এ ছোট ছোট কনসাইনমেন্টে মাছ এক্সপোর্ট করছি। কিন্তু গার্মেন্টস রফতানী বিষয়টা কি জিনিস, আমার কোন ধারনাই ছিল না, সেদিন পর্যন্ত। তবু ওর কথা কিছুটা বুঝে আর কিছুটা না বুঝেই রাজী হয়ে গেলাম।

জানলাম, সিঙ্গাপুরভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান জয়েন্ট-ভেঞ্চারে বাংলাদেশের কয়েকটি গ্রুপকে বাছাই করে কয়েকটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী করবে এবং উৎপাদিত পোশাক তাদের ব্যবস্থাপনায় বিদেশে রফতানীর ব্যবস্থা করবে। ৮ বছরের 'বাই-ব্যাক' গ্যারান্টি। হাতে আছে মাত্র ১৫ দিন। গেরিলা তৎপরতায় চুপচাপ সকাল-সন্ধ্যা নাক ডুবিয়ে কাজ শেষ করলাম। প্রজেক্ট প্রপোজাল তৈরী এবং নানা সরকারী অফিসের অনুমতি বের করা ইত্যাদি।

সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি আসলেন অবশেষে, ইচ্ছুক প্রার্থীদের মধ্য থেকে বাছাইয়ের জন্য। খোলা আলোচনা শুরু হলো। গিয়ে দেখি, অনেক পরিচিত মুখ। আরো বুঝে নিলাম, ওরা প্রায় সবাই গত ৬ মাস ধরে এর পেছনে কাজ করছে। দেখা হয়ে গেল আলমের সাথে। আরিফের মতই আমার স্কুল-বন্ধু। খুব কাছের।

আলোচনার মাঝ পর্যায়ে আমার মনে হতে লাগল, সিঙ্গাপুরী ভদ্রলোকের ভাল ভাল চমকদার কথাবার্তার ভেতরে অন্য ফন্দি আছে! আরো মনোযোগী হয়ে বসলাম। প্রায় শেষ ভাগে আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোককে কিছু প্রশ্ন করলাম। উনি ব্যাপারটা পছন্দ করলেন না এবং ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে উত্তর দিলেন। তাতে আমি আরো শক্ত হয়ে ধীর মাথায় দাঁড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম, এই প্রজেক্টের ব্যাপারে আমি কোনরকম আস্থা স্থাপন করতে পারছি না এবং তখনই প্রজেক্ট থেকে নিজের নাম কেটে ফেলার ঘোষণা

দিয়ে, আলোচনা থেকে উঠে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে, এক রকম হট্টগোল বেঁধে গেলো আসরে। কেউ কেউ ভয় পেয়ে গেল। বন্ধু আলম, যে এর মধ্যে অন্যতম আগ্রহী প্রার্থীদের মধ্যে একজন, সে এসে বলল, দোস্ত, আমি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী দিচ্ছি, এই কথাটা বাংলাদেশের দুই একজন মানুষ ছাড়া সবাই জানে। এখন কি হবে? কোন্ সাহসে সিঙ্গাপুরী পার্টির সাথে হাত মেলাবো, আর কিভাবেই বা প্রজেক্ট বাতিল করবো? তুই একটা বুদ্ধি দে! সরাসরি বললাম, আমি এদের সাথে কোনভাবেই যাবো না। আর আলাদা গার্মেন্টস করার মতো অতো টাকা-পয়সা আমার নেই। এভাবেই সেদিনের পালা শেষ, আলমের সাথে। কিন্তু আরিফ এদিকে সিঙ্গাপুরী ভদ্রলোকের গুণমুগ্ধ ভক্তদের দলে রয়ে গেলো।

পরদিন সকালেই আলমের ফোন। দোস্ত, খুব দরকার সামনাসামনি কথা বলার। এক সাথে বসলাম। আলম বলল, আমি আমার বাসার ওপরে নিজ দায়িত্বে ফ্যাক্টরী ফ্লোর করে নেব। তোর আমার মিলে নগদ যা আছে, সাথে আরো কয়েকজনকে নিয়ে ছোট খাট একটা ইউনিট করে ফেলবো। তারপর যেই কথা, সেই কাজ। পরিচিত হলাম দেওয়ান সাহেব, খোকন ভাই, টাইফুন ভাই (ওনারা দুই আপন ভাই, এখন বেঁচে নেই) আর হাসি খুশী মনা ভাইয়ের সাথে। ওসমানের কথা পরে লিখলাম। ওসমান প্রথম থেকেই এই উদ্যোগের পুরোভাগে ছিলো আমার দিক থেকে। ও আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু এবং একটা সময় পর্যন্ত আমাদের পরিবারের একজনের মতই থাকতো আমাদের সাথে। যাই হোক, দাঁড়িয়ে গেল 'দি ইয়ক গার্মেন্টস লিঃ'।

কাকরাইল মসজিদ থেকে সোজা সূতো ধরে জোনাকী সিনেমা হল পর্যন্ত টানলে, তার অর্ধেক দূরত্বে হাতের বাম দিকের গলিতে ঢুকে আবার ডান মোড়ের ডান দিকের বাসাটি তখন পুরোদস্তুর একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী। দিন রাত নিঃশ্বাস ফেলে না-ফেলে কাজ চলছে। টাইম আর ওভারটাইমের ফাঁদে বন্দী হওয়া 'দি ইয়ক'।

এমন এক বিকেল বেলা। দোতলায় পরিচালকদের জন্য বরাদ্দকৃত একটা রুমে গালে হাত দিয়ে, মন খারাপ করে বসে আছি। দোতলায় ঢুকে বাম দিকে গেলেই 'দি ইয়ক' এর সোইং ফ্লোর। সবাই অপেক্ষায়, একটু পরেই বায়ার আসবে সাবকন্ট্রাক্ট কাজের (লেডিজ ব্লাউজ) ইন্সপেকশনের জন্যে। তার জন্য বিস্কিট, চানাচুর, আপেল, চা এবং কোক একসাথে জগাখিচুরী আয়োজন করা হলো।

একটু পরে হুট ক'রে এক সুন্দরী বিদেশিনী সোইং ফ্লোরে ঢুকে পড়লেন তার বাঙালী দুই একজন সহকারী সমেত। সব মিলে মিনিট দশেক থাকলেন উনি। চার-পাঁচটা ব্লাউজ ইন্সপেকশন করেই সেগুলো আকাশে উড়িয়ে দিয়ে চেঁচামেচি শুরু করলেন এবং নিজ ভাষায় গালাগালি করতে থাকলেন। গায়ে হাত দেয়ার অভ্যেস নেই বলেই হয়তোবা সেটা ছাড়া

সেই মহিলা বাকী সবটুকুই করলেন এবং বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন আমাদের রাস্তায় বসে ঝাল-মুড়ির ব্যবসা পাতলেই ভাল হতো, অন্ততঃ গার্মেন্টস নয়। চা চানাচুর ও কোক বেচারারা ভয়ে বায়ারের চেহারা দেখার সাহস পায়নি। তাদের মতই ভাষাহীন চেহারা আর অপমান মুখে লেপ্টে বসে থাকলাম। একি দূরাবস্থা!

সম্ভবতঃ পরেরদিন, গার্মেন্টসের সাথে জড়িত এক বন্ধু আসলেন, এমনি দেখা করতে। গতকালের ঘটনা খুলে বললাম তাকে। সে হেসে বলল, এতো কিছুই নয়, তার কিছুদিন আগে পরিচিত আরেকটা ফ্যাক্টরীতে অন্য এক বিদেশী মহিলা বায়ার ইন্সপেকশনে এসে পুরোটা প্রডাকশনই বাতিল করে দিলেন। তখন বেচারা পরিচালকদের একজন অসহায়ের মতো তাকে জিজ্ঞাসা করল, এখন আমরা কি করবো? আর এর সমাধান কি? সাথে সাথে মহিলা স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, "You have to eat them all and then I will think about any further step..." মুহূর্তেই দুঃখ কিছু লাঘব হলেও বিশাল দুশ্চিন্তায় ধরে বসল আমাকে।

ভাবতে থাকলাম। প্রথমে আবিষ্কার করলাম, অল্পদিনের মধ্যেই এই কর্মকান্ডের প্রতি মায়া বেঁধে যাচ্ছে। এতগুলো লোক সকাল-সন্ধ্যা কাজ করছে। ছুটি হচ্ছে। আবার আসছে। মাস গেলে বেতন হাতে হাসি মুখে বাড়ী ফিরছে। ওদের শ্রমে তৈরী জামা-কাপড়গুলো বাক্স-বন্দী হয়ে চিরকালীন বিদেশ সফরে রওনা দিচ্ছে। অন্য রকম ভাল লাগা! আর এর উল্টো পিঠে লিখা বাস্তবতা বড় কঠিন। একটু এদিক সেদিক হলে, আজন্ম অপরিশোধযোগ্য ঋণের বোঝা কাঁধে! ভাবনার চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা জিনিস বের করলাম, এই ব্যবসায় টিকে থাকতে হলে দুটো জিনিস ভীষন প্রয়োজন - যোগ্য এবং সৎ মানুষের একটা শক্ত টিম এবং টাকা!

'নিউ এলিফ্যান্ট রোড' আমার জীবনে বরাবর স্মৃতিময়। বাসা থেকে গাড়ীতে, রিকশায় অথবা অনেক অনেক সময় পায়ে হেঁটে এলিফ্যান্ট রোড ডিঙ্গিয়ে 'ইউ-ল্যাব' স্কুলে যাওয়া। তারপর তারই পাশ ঘেঁষে ঢাকা কলেজের জীবন। বিশ্ববিদ্যালয় সময়কালে এলিফ্যান্ট রোড ছিল পায়ে হাঁটা পথের একমাত্র ট্রানজিট রুট। বাড়তি বিষয় ছিল, সেখানে আমার স্কুল বন্ধুদের বাসা। কি আনন্দ! স্কুল থেকে ফেরার সময় সেখানে কিছুক্ষণ থেমে-নেমে তারপর বাড়ী। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকটা সময় ছিল সে রকমের।

সেখানে রোড জাংশানে যার বাসা ছিল, স্বল্পভাষী, হাসি খুশী আর ভেতরে ভেতরে কিঞ্চিত বারুদ স্বভাবের সেই বন্ধুটির সাথে মাঝখানে চার-পাঁচ বছর দেখা হয়নি। দেখা যে হয়নি, সে কথা কখনো মনে আসতো না। তাই সে না ছিঁড়ে যাওয়া সূতোর টানে ১৯৮৫ সালে হঠাৎ করে আবার তার বাসায় কাকতালীয়ভাবে যাওয়া শুরু। জায়গার চেহারা বদল হয়েছে

এর মধ্যে। পেছনে তাদের মূল বাড়ীর সাথে লাগোয়া তাদেরই জায়গাতে মেইন রোড পর্যন্ত টেনে নিয়ে করা একটি জুতার মার্কেট হয়ে গেছে তাদের তখন। "জাহানারা ভবন"। তার চারতলায় বন্ধুটি থাকে। একা। স্কুল কলেজ সব বিদ্যাপীঠ পেরিয়ে সে তখন একজন পোক্ত ব্যবসায়ী।

আবার জমে গেলাম দুজনে। কাজ শেষে, বিকেল শেষে অজান্তে সিড়ি ভেঙ্গে চার তলায় হাজির। তারপর চমৎকার সময়, মন ভাসিয়ে দেয়ার আনন্দ। প্রতিদিন।

বন্ধুটির নাম নান্নু। মইনুল আহসান পুরো নাম। কথায় কথায় কর্মক্ষেত্রের কথা আসলো। ওর ব্যবসা সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা আর আমার গার্মেন্টস নিয়ে নিজস্ব ভাবনাগুলো টেবিলের উপর উঠলো। তার আগ্রহ দেখে গার্মেন্টস বিষয়ে আরো বিস্তারিত ঘনঘটায় গেলাম দু'জনে। সে জেনে নিলো, মোটামুটি অর্থের যোগান হলে বাকীটা গোছানোর ব্যাপারে চিন্তা করা যাবে।

দ্বিতীয় বৈঠকেই ও একটা পরিমান টাকার নিশ্চয়তা দিলো। সে সময়ে প্রয়োজনের পুরোটা সেটা নয়, তবে সেটাও অনেক পরিমান অর্থ যোগানের আশ্বাস। এর উপর ভর করে আমি দৌঁড়ালাম ফরহাদ ভাইয়ের কাছে। ফরহাদ ভাই আমার বন্ধু রানার পিঠাপিঠি বড় ভাই এবং আমার বড় ভাই-কাম-বন্ধু। আমার সাথে কথা বলার পর উনি লন্ডনে থাকা ওনার ভায়রা সাদিক ভাইয়ের সাথে কথা বললেন। দেখতে পেলাম, ফরহাদ ভাই অন্তর খুলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। অর্থ যোগানের চেহারা ভারী হতে থাকলো। আমার সামান্য কিছু, ওসমানের কিছু, সাথে যোগ দিলো সেই যোগানের বাক্সতে।

নান্নুর বাসায় আবার আসা যাওয়া শুরুর কয়েকমাস আগের কথা। ভাবনা ঘুরছে গার্মেন্টসকে নিয়ে। 'দি ইয়ক' তখন শান্তিনগরের একটি পরিপাটি ফ্যাক্টরীর সাবকন্ট্রাক্ট করছে, আলমের সাথে ঐ ফ্যাক্টরীর মালিকপক্ষের পরিচয়ের সুবাদে। গার্মেন্টসের কর্মকান্ডের সাথে জড়িত অনেকের সাথে দেখা হচ্ছে প্রতিদিন। সকাল বিকেল। সেভাবেই শান্তিনগরের সেই ফ্যাক্টরীর একজনের সাথে পরিচয়। জানতে পেলাম, উনি প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন কর্মকান্ডের মূখ্য ব্যক্তি। আলমের সাথেই কথা হচ্ছে সাবকন্ট্রাক্ট বিষয়ে। আমি পাশে দাঁড়িয়ে। লম্বাটে, চোখে চশমা, গোছানো চেহারার মানুষ। তার চেয়ে আরো বেশী গুছিয়ে, শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলছেন উনি, আলমের সাথে।

ফিরে আসলাম কাকরাইলে। ওনার সাথে আবার দেখা হলো কয়েকবার কাজের সুবাদে, কাকরাইল-শান্তিনগর দুই জায়গাতেই। একটু একটু করে আমার সাথেও কথা হচ্ছে। সে সময় হঠাৎ করে 'ইয়ক' এর প্রডাকশানে কিছু লোক নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিলো।

আমি এবং আলম ওনাকে অনুরোধ করলাম, ইন্টারভিউ সেশানে থাকার জন্য। উনি আসলেন এবং অনেক সময় ধরে কাজটা সারলেন। ওনার সম্পর্কে আমার ধারনা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল। জানলাম, গার্মেন্টস প্রডাকশন সম্বন্ধে এ দেশে হাতে গোনা জানা লোকদের একজন উনি। এছাড়া বুঝে নিলাম, উনি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে একজন ভাল মানুষ। চশমাধারী লোকটা ঘিরে ভাল লাগা তৈরী হওয়া, বেড়ে ওঠা চলছেই!

এর মধ্যে আমার আশঙ্কার পথ ধরে অর্থ সংকটের কারণে 'দি ইয়ক' এর ভবিষ্যৎ প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকলো এবং ধারাবাহিকতায় নিজেদের মধ্যে মতভেদ তৈরী হওয়া শুরু হলো। এক সময়ে 'দি ইয়ক' একটি বড় গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি হয়ে গেল। ইয়ক মালিকদের বেশীর ভাগ বেরিয়ে আসলেন। শুধু আলম ও মনা ভাই তাদের শেয়ার নিয়ে ইয়ক-এ থেকে গেলো সেই বড় গ্রুপের সাথে। এখন মনে হয়, সেই সময়ের জন্য সেটাই ছিলো হয়তো বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত।

এলিফ্যান্ট রোডে ফিরে আসি। নান্নুর সাথে তখন সার্বক্ষণিক দিনপাত। ইয়ক-এর পরেও ওসমান আছে আমার সাথে। নান্নুকে লম্বাটে, চশমাধারী মানুষটার কথা বললাম। আমার সাথে একশত ভাগ সায় দিলো ও। এর মধ্যে ভুলে গিয়েছিলাম, মানুষটির সাথে বেশ কিছুদিন যোগাযোগ নেই। তার খোঁজ নেয়া হলো। জানতে পেলাম, উনি আর শান্তিনগরে নেই। কাকতালীয়ভাবে 'জাহানারা ভবন' থেকে হেঁটে যাওয়া দূরত্বের একটি ফ্যাক্টরীর প্রডাকশনের দায়িত্বে সেই মুহূর্তে। সরাসরি চলে গেলাম। তখন একবারও নিজে নিজে যাচাই করে দেখিনি, যে ভাবনার ওপর ভিত্তি করে ওনার সাথে কথা বলব, সেটা বলার মতো প্রাসঙ্গিক অবস্থা আছে কিনা অথবা উনি আদৌ এ ধরনের প্রস্তাবকে কিভাবে দেখবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাই হোক। তার সাথে দেখা হলো। ঝড়ের আবেগে আমার কথাগুলো তাকে বললাম। বললাম, আর্থিক যোগানের এইরকম ব্যবস্থায় একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী করতে চাই - একটা সুন্দর পরিবারের ছক এঁকে নিয়ে। সেখানে আমরা ক'জন মিলে হবে তার শুরু। ভালভাবে কথাগুলো শুনে উনি বিনয়ের সাথে দুদিন সময় চাইলেন। দু'দিন পর আসলেন উনি এলিফ্যান্ট রোডের চারতলায়। অবাক করে দিয়েই সহজ এবং দৃঢ় ভঙ্গিতে জানালেন, হ্যাঁ, আমি আছি আপনাদের সাথে। সেই চশমাধারী মানুষটির নাম এমদাদুল ইসলাম। এমদাদ ভাই।

সেদিনের কথাবার্তার মধ্যে এমদাদ ভাই একটা প্রস্তাব রাখলেন। ওনার একজন বিশেষ সহকর্মী বন্ধুকে (যিনি তখন এমদাদ ভাইয়ের সাথে একই প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন) এই নতুন পরিবারে পরিবারভুক্ত করা যায় কিনা। রাজী হয়ে গেলাম। পরদিনই ওনার সাথে

দেখা। মাথাভরা কোকড়া চুলের ছোট খাট মানুষ। মহা শান্ত চেহারা! নেসার ভাই ছাড়া আর কে হবেন উনি। নেসার আহমেদ। দুচারদিন যাওয়ার পর মনে হলো, ওনার নাম প্রথম থেকেই লিখা হয়েছিল পরিবারটির খাতায়। নতুনভাবে অন্তর্ভূক্ত মানুষের কোন গন্ধই পাওয়া গেলনা, ওনার উপস্থিতি থেকে। পরবর্তীতে কাজের বেলায় এবং অবেলার মুহূর্তগুলোতে নেসার ভাইয়ের সাথে আমার সময় কেটেছে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী।

দেখতে দেখতে দলটি বড় হয়ে গেল। নান্নু, এমদাদ ভাই, নেসার ভাই (ওনার নামের সঠিক উচ্চারণ নিসার, তবে আমি নেসার ভাই-ই ডাকতাম), ওসমান, ফরহাদ ভাই, সাদিক ভাই। একই সময়ে একই নামে আরেকজন এলেন দলে। ওসমান ভাই। জাফর ওসমান। এক কথায় তার পরিচয় ছিল, সাদা মনের মানুষ।

এক পা দুপা করে দলটি এগিয়ে যাচ্ছে। প্রথম যাত্রায় এমদাদ ভাইয়ের আয়োজনে প্লেইন ও ওভারলক মিলে বাজার থেকে আটটি নতুন মেশিন কেনা হলো। পরপরই নেসার ভাইয়ের উদ্যোগে গ্রীন রোডের একটি দুই লাইনের ফ্যাক্টরী কেনার ব্যবস্থা (যে ফ্যাক্টরীটির প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন প্রয়াত বাবু ভাই) এবং ইসলামী ব্যাংকের কর্তৃপক্ষের সাথে মালিকানা বদলের ফায়সালা বিষয়ে নিস্পত্তি আর মিরপুর সাড়ে এগারোতে ফ্যাক্টরীটির জন্য নতুন জায়গা চূড়ান্ত করা ইত্যাদি, সব যেন ছক বেঁধে এগুচ্ছে। নান্নু তাদের মার্কেটের দোতলায় ছোট একটা রুমে একটা টেবিল, দুইটা চেয়ারের ব্যবস্থা করে দিল। সেটাই সেই পরিবারের প্রথম অফিস।

এমদাদ ভাই, নেসার ভাই দিন রাত ব্যস্ত, পুরবী মার্কেটের ৪র্থ তলায় নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। একদিন মেশিন আর আসবাবপত্র আর অনেকগুলো মানুষসহ বাতি জ্বললো সেই ঘরটিতে। উদ্বোধনের মিলাদ শেষে মিষ্টিমুখ। কাজে উড়াল দেয়ার অপেক্ষায় সম্পূর্ন সাজে সজ্জিত একটি রফতানীমূখী গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী। নাম 'ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ'!

এলিফ্যান্ট রোডে অফিসের উল্টোদিকের একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী। কোনদিন নজরে আসেনি। ঠিক ছয়মাস যেতে না যেতে সেই ফ্যাক্টরীটি হেঁটে হেঁটে মিরপুর আসলো। একই ছাদের নীচে এই পরিবারের মালিকানায় ব্যাবিলনের পাশে এসে জায়গা নিলো সুরভী গার্মেন্টস লিঃ। ব্যাবিলন-সুরভীর চাকা ঘুরতে শুরু করল একই ছাদের নীচে। পাশাপাশি। সে সময়ের কিছু পরে আবিদ আসলো আমেরিকা থেকে। আবিদ আমাদের ইউ-ল্যাবের ছাত্র এবং আমার ছোট ভাইয়ের কাছের বন্ধু। সে যেন আসলো এই পরিবারের জন্য বরাদ্দকৃত দ্বিতীয় ট্রেনে চড়ে। "ইয়েস কার্ড" হাতে নিয়ে। আবিদের সরল কথা বার্তা এবং পুরোনো পরিচয়ের সুবাদে সবার কাছে ছোট ভাই-কাম-পার্টনার হিসেবে আদরের জায়গা হয়ে গেল তার, দলে।

এর বেশ কিছুদিন পরে। ল্যাপিন ড্রেসেস লিঃ আলোর মুখ দেখলো। তৃতীয় ট্রেনে চেপে আসলেন সালাম ভাই। সুইজারল্যান্ড থেকে। ওনার ধার্মিক এবং কর্মঠ ব্যক্তিত্ব ওনাকে পরিবারে শক্ত অবস্থানে জায়গা করে দিলো।

শেষের মানুষ নয়, তবু সবশেষে প্রথম ট্রেনের একজন নীরব যাত্রীর কথা বলছি। উনি হচ্ছেন মুরাদ ভাই। নান্নুর সবচেয়ে বড় ভাই। অনেকটা সময় ধরে বৃহত্তর প্রয়োজনে মুরাদ ভাই এ দলের চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

তবে একথা সত্যি, প্রথম ট্রেন থেকে শুরু করে শেষ ট্রেন থেকে নামা শেষের যাত্রীর পরিবারে অন্তর্ভূক্তির পর মনে হয়েছে, একটা দল পুরো করার জন্য সেই সময়ে সবাইকেই দরকার ছিল। পুরোদল নিয়ে মাঠে নামার মতই সেটা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এরপর এই দলটিকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আলোতে, বৃষ্টিতে, জ্বরাতে-খরাতে, প্লাবনে-ভাঙ্গনে থামাতে হয়নি এর এগিয়ে চলা।

## অন্য-অনন্যঃ এক

হঠাৎ ক'রে তাল উঠলো, নেপাল যাবো। ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস। এমদাদ ভাই, নেসার ভাই, আবিদ আর আমি। কাঠমুন্ডু নেমে ট্যাক্সি ক'রে পোখারা যাত্রা। নেপাল ভ্রমনের সনাতনী কায়দা এ রকম। ট্যাক্সি ছুটছে। কিছুক্ষণ পরেই মনে হলোঃ দুনিয়ার এক ভিন্ন এবং অবাক করা সৌন্দর্যের ভেতর ঢুকছি আর ঢুকছি। পাহাড় কেটে সাপের মতো রাস্তা। দুপাশে হাজার হাজার ফুট নীচে বড় বড় সাদা পাথর, নদী, ঝরনা আর পাহাড়ী সবুজ। গাড়ী উঠছে, উড়ে উড়ে যাচ্ছে কোনমতে চাকাগুলো রাস্তা ছুঁয়ে ছুঁয়ে। এক বাঁকে, ড্রাইভার হঠাৎ গাড়ী থামিয়ে সবাইকে নামতে বলল। নেমে দেখলাম, সামনে পেছনে, উপরে এবং নীচে পুরোটাই আকাশ। যেন আকাশের বুক বরাবর উচ্চতায় আমরা দাঁড়িয়ে। দেখতে পেলাম, মেঘগুলো হেঁটে হেঁটে এসে আমাদের শার্টের, প্যান্টের পকেটগুলোতে ঢুকে যাচ্ছে। বুকের ভেতরের অদৃশ্য ফুটো দিয়ে মেঘগুলো ঢুকে আমাদের সারা বুক ভরিয়ে দিলো। ভিজিয়ে দিলো। একি আনন্দ যেন অচীন সুখে বোকা হয়ে যাওয়া!

ঠিক হলো, এক রাত চিতন পার্কে থাকবো। পার্ক নয় গভীর জঙ্গল। সেখানে বাঘ কুমীরের মাঝখানে রাত্রি যাপন। নেসার ভাই আর আমি এক তাঁবুতে। এমদাদ ভাই আর আবিদ অন্য তাঁবুতে। ভয়ানক অন্ধকারে তাঁবুর বাইরে হারিকেন জ্বলছে টিম্ টিম্ করে। দূর থেকে ভেসে আসছে মানুষ খেকোদের অস্পষ্ট, ছেঁড়া ছেঁড়া আওয়াজ। সারারাত ঘুম হয়নি কারো। মনে হচ্ছিল, যে কোন সময় বাঘ অথবা কুমীর আমাদের পা কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে চলে যাবে।

দিনের বেলা ট্যাক্সি করে ঘুরছি এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। ভেতরে অদ্ভুত মায়াবী মূর্ছনায় গান চলছে 'এ্যাল ষ্টুয়ার্টের'। এমদাদ ভাই ক্যাসেটটা নিয়ে এসেছিলেন। শিল্পীর গলা ও গীটার সারা ভ্রমন জুড়ে আমাদের কাত্ করে রেখেছিলঃ On the Border, Year of the Cat, Broadway Hotel, Infinity.... বারে বারে সবাই আনমনা। তবে কারণে অকারণে আবিদ একটু বেশী আনমনা হয়ে যাওয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছিল এবং সবার সেটা চোখে পড়ার পর, আবিদ কেবল প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছিল। একটিবারও সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি তার কাছে।

## অন্য-অনন্যঃ দুই

সকাল-সন্ধ্যা মিরপুর ফ্যাক্টরীতেই আটকে থাকতেন এমদাদ ভাই। আর এদিকে, অফিস ধানমন্ডিতে সরে যাবার আগ পর্যন্ত, নেসার ভাই আর আমি সারাক্ষণ এক সাথে। কাজে অকাজে শত জায়গায় কতো-শত মানুষের কাছে যাওয়া দু'জন মিলে। সেই স্মৃতির ভীড়ে এই মুহূর্তে যাকে সবচাইতে বেশী Miss করছি, সে হচ্ছে একটি ৭০ সিঃ সিঃ হোন্ডা মটর বাইক। মালিক ও ড্রাইভার একজনই। নেসার ভাই। পেছনে প্যাসেঞ্জার আমি। ঢাকার ভেতরে এমন জায়গা নেই, যেখানে যাওয়া হয়নি সেই বাইকে চড়ে।

সেই 'বাইকটা' এখনও বেঁচে আছে কিনা, রোদে বৃষ্টিতে রাস্তায় রাস্তায় দু'চাকাতে ধূলো কাদা মাখে কিনা, বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ তার নামে এখনো ফিটনেস সার্টিফিকেট বরাদ্দ করে কিনা- জানি না। তবে ও ছিলো আমাদের আপন হিতৈষীর একজন!

## অন্য-অনন্যঃ তিন

এতো মানুষ থাকতে 'মুক্তার' কথা মনে পড়ছে কেন জানি না! আমার সাথে তার আলাদা করে খাতিরও ছিল না কখনো। নেসার ভাইদের গ্রীন রোড পাড়ার পড়শী ছিল ও । আর দায়িত্বে ছিল ফ্যাক্টরীর ষ্টোর। ওর সাথে দেখা হলেই মনের মধ্যে শীতল-পাটি বিছিয়ে কথা বলতো। বোঝাতে চেষ্টা করতো সবাইকে, এই ফ্যাক্টরীর রক্ষণাবেক্ষণ, ভাল-মন্দের পুরো দায়িত্বতো তারই হাতে! কি বিশাল চিন্তা। কোম্পানীতে তার অপরিহার্য্যতার কথা প্রকাশের সরলতা, আমার মনের ভেতর একজন অপরিহার্য্য মানুষ করে রেখেছে তাকে - আজও।

## অন্য-অনন্যঃ চার

ফরহাদ ভাই। আমাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্কের গন্ডীর বাইরে ছিল তার আসল পরিচয়। উনি ছিলেন আমাদের সবার দরদী বড় ভাই। আবার সময় বিশেষে, লজ্জা শরমের গোষ্ঠী উদ্ধার করা ব্যক্তিত্বে জ্বলজ্বল একজন পরান-বন্ধু।

এক সময় সাংসারিক সিদ্ধান্তে স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ লন্ডন পাড়ি দিলেন ফরহাদ ভাই। সেখানে

থাকতে লাগলেন। তবু দূর থেকে আমাদের সবার জন্য ভালবাসার খবরদারী ছিল সবার চেয়ে বেশী।

২রা মে, ১৯৯৪ সাল। খুব ভোরে লন্ডন থেকে ফোন আসলো। ফরহাদ ভাই বেঁচে নেই। আগের দিন বিকেলে বাচ্চাদের সাথে মাঠে সময় কাটানোর সময় ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। বহু চেষ্টা করে ফেরানো যায়নি তাকে।

দু'দিন পর, উপরে কাঁচের ঢাকনা বসানো কফিনে, নিঝুম ঘুম দিয়ে পরিষ্কার শান্ত চেহারায় ফরহাদ ভাই ঢাকায় ফিরলেন। মিরপুর ফ্যাক্টরী পাড়া থেকে শুরু ক'রে গ্রীন রোড, ধানমন্ডি এবং তার আশ-পাশ পর্যন্ত বিস্তৃত সবার জন্য ফরহাদ ভাইয়ের নিজ হাতে বিছানো ভালবাসার অদৃশ্য চাটাইয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চিৎকার ক'রে কাঁদলাম আমরা সবাই!!

অনেকদিন থামেনি সে কান্না! কান্নায় ভেজা সে অদৃশ্য চাটাই কেউ যদি আজও খুঁজে দেখে, ছুঁয়ে দেখে, নিশ্চয়ই জানবে, সেই চাটাই এখনো শুকায়নি।

আরও জানি, এরকম অদৃশ্য ভেজা চাটাই আরও একটা আছে, কোথাও না কোথাও। সেখানে নাম লিখা আছে-সানজিয়ার!

## অন্য-অনন্যঃ পাঁচ

এক কাবুলীওয়ালার কথা দিয়ে শেষ করি। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। খবর এলো, রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালা কলকাতা থেকে এসেছে ঢাকার সিনেমা পর্দায়। আর কথা নেই। সোজা গিয়ে হলে ঢুকলাম। নাম ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের সেই কাবুলীওয়ালা।

মিনির জন্য বুকে লালন করা ভালবাসার কথা, মিনিকে অনেক বছর পর বোঝাতে না পারার সেকি যন্ত্রণা! বুক ভারী করে হল থেকে বেরুলাম।
এই পরিবারে আমার দু'জন বন্ধু ছিলো। ঠিক ছোট্ট মিনির মতো বয়সে ওদের আমার সাথে হয়েছিলো বন্ধুত্ব। আজ এতো বছর পর, ওদের কথা ভাবলেই আমার কাবুলীওয়ালার কথা মনে হয়। রবীঠাকুরের সেই কাবুলীওয়ালার বাস্তবতা জ্ঞান ছিল না। তাই সেধে সেধে কষ্ট নিয়েছিল, মিনির সাথে দেখা করতে গিয়ে।

আমি সেই বোকামী কখনো করিনি। তবে মনের ভেতর নিজে এক কাবুলীওয়ালাকে সাজিয়ে বুঝতে পারি, মিনির মতো করেই এখনও আমার কাছে জীবন্ত, ঐ দুটি ছোট্ট বন্ধু - জোড়া!!

আকাশেরও মৌজা ম্যাপ, দাগ নম্বর, খতিয়ান থাকতে পারে। তবে আমার জানা নেই। থাকলেও এটা আমার কাছে আজ বড় নয়-এর বায়া দলিল, আজকের দলিল, আরএস রেকর্ডে কি লিখা আছে। আমি জানি, যাকে নিয়ে লিখলাম এতক্ষণ, সেই 'ব্যাবিলন' এখন সেই আকাশের আলো ছড়ানো এক তারা। আলো ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

এর সাথে মানুষগুলোর কেউ কেউ এখনও একসাথে, কেউ কেউ চলে গেছে, জীবনের সব হিসেব খাতার বাইরে-নিঝুম পাড়ায়। কেউ কেউ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভিন্ন বৃত্তে - সময়ের যোগ বিয়োগের ফলাফলে সেটাই সঠিক হিসেব। আর সেখানে দাঁড়িয়েই লিখতে ইচ্ছে হলো এই সব স্মৃতির ঝাপসা জলের উপর নৌকা চালিয়ে। সেখানে বারে বার জাল ফেলে, যা যা জালে উঠে আসলো, তাই-ই তুলে নিলাম।

হয়তোবা সম্পূর্ণতা নিয়ে, নিঁখুত হিসেব কষে, খুব গুছিয়ে জানি তা দিয়ে পুরো ছবিটা আঁকা যাবে না, তবু যতটুকু চেষ্টা করেছি, তার শিরোনাম দেয়া যেতে পারে "ব্যাবিলন-ভোরের গল্প"।

# ব্যাবিলন কথন

এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন, ব্যাবিলন গ্রুপ

মহাবিশ্বের সৃষ্টি বা জন্ম আমরা কেউ প্রত্যক্ষ করিনি। আর তাতে করে সমস্যাটাও জটিল হয়েছে। যুগ যুগ ধরে তাবৎ বিজ্ঞানীদের গবেষণা চলছে কবে এবং কিভাবে এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড জাত হলো। ফলশ্রুতিতে এরই মধ্যে বিবিধ তত্ত্ব ও মতের প্রকাশ ঘটেছে এই বিষয়ে। কিন্তু নিঃসন্দেহ হওয়া যাচ্ছেনা কোনটির বিষয়েই। তা সাড়ে-চারশ, পাঁচশ কোটি বছর আগে যেই যজ্ঞ সুচীত হয়েছিল বলে মনে করা হয় তা নিয়ে খনিকটা গোল বাঁধতেই পারে। কিন্তু ব্যাবিলন?

না, মেসোপটেমিয়ার ব্যাবিলন নয়। আমাদের প্রিয় ব্যাবিলন গ্রুপের কথাই বলছি। পাঁচশ কোটি বছর বা পাঁচ হাজার বছর আগের কথা নয়। মাত্র বিশ-একুশ বছরের ইতিহাস। তাও মানুষের মনতো। স্মৃতি থেকে কিছু হারিয়ে যেতেই পারে। লেগে যেতে পারে তাতে কিছু বাড়তি রং। অনেক ক্ষেত্রে রং (Colour) লাগা রং (Wrong) নয়। তবে রঙিন ইতিহাস কাম্য হলেও রাঙানো ইতিহাস কাম্য নয়। কাজেই তেমনটি হওয়ার আগেই ব্যাবিলনের সৃষ্টি কাহিনীর কিছুটা বলে ফেলা যাক। তবে এই স্বল্প পরিসরে সুবিস্তারে তা বলার সুযোগ নেই।

আজকের ব্যাবিলন পরিবারের অনেকেই বোধ হয় জানেন ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ দিয়েই এই গ্রুপের যাত্রা শুরু ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসে। তবে যা অনেকেই জানেননা তা হলো ব্যাবিলন গার্মেন্টস এর জন্ম কিন্তু হয়েছিল ১৯৮৪ সালে ভিন্ন উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে।

সেই বছরই অর্থাৎ ১৯৮৪ সনে ঢাকার শান্তিনগরস্থ একটি রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে যোগ দিয়েছি আমি প্রডাকশন ম্যানেজার হিসেবে। ওখানে থেকে পরিচয় হলো সদ্য প্রতিষ্ঠিত আরেকটি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান দি ইয়ক (The Yolk) গার্মেন্টস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম মুর্শেদের সাথে। সাধারণ পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব হতে সময় লাগেনি। সময় লাগেনি মুর্শেদ ভাইয়েরও সিদ্ধান্ত নিতে। ইয়ক গার্মেন্টস তাঁর স্বপ্ন প্রকল্প (Dream Project) হয়নি-তিনি মনে করতেন। কাজেই চাই নতুন নতুন উদ্যোগ-তার সংগে চাই এমদাদ ভাইকে অর্থাৎ আমাকে।

মুর্শেদ ভাই যখন আমার কাছে প্রস্তাবটি রাখলেন তখন আমি Astras Garments Ltd. এর উৎপাদন ব্যবস্থাপক। ১৯৮৫ সাল সেটা। অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব-এবং অবাস্তবও বটে আমার জন্য। বিনিয়োগ করার মত টাকা কই আমার কাছে? একটুও চিন্তা করবেন না-শুধু আপনি এলেই হবে। টাকা জোগাড় হয়ে যাবে। ব্যাংক লোন পেয়ে যাবো। আশ্বাস দিলেন মুর্শেদ ভাই। উনার প্রবল ইচ্ছা ও সংকল্প আমার সম্মতি আদায় করে নিল প্রায় অনায়াসেই।

একে একে পরিচয় হ'ল ফরহাদ ভাই (প্রয়াত), নান্নু ভাই (মইনুল আহসান), মোহাম্মদ ওসমান প্রমুখের

সাথে। সাব্যস্ত হলো 'সুন্দর কনসোর্টিয়াম' নামে একটি কোম্পানি হবে আমাদের। সুন্দর কনসোর্টিয়াম প্রথমে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করবে। পরে আস্তে আস্তে অন্যান্য প্রকল্প গ্রহন করা হবে।

সময় বয়ে যায়, ঘন ঘন মিটিং হয়- কিন্তু ব্যাংক লোন আর হয় না। মুর্শেদ ভাই এতে দমবার পাত্র নন। ঋণ ছাড়াই আমরা শুরু করব।

পুরনো ঢাকায় একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির খোঁজ পাওয়া গেল। বিক্রি হবে। দেখতে গেলাম দল বেঁধে। না হলোনা। সাধ্যের বাইরে দাম। এমন সময় রামপুরায় এক কোম্পানির কাছে কিছু সেলাই মেশিন পাওয়া গেল একদম নতুন অবস্থায়। যতদুর মনে পড়ে আটটা প্লেইন মেশিন ও ছয়টা ওভারলক মেশিন আমরা কিনলাম। ব্যাবিলনের বর্তমান ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর জনাব মইনুল আহ্সান (আমাদের নান্নুভাই) সাহেবদের একটি মার্কেট বিল্ডিং আছে নিউ এলিফ্যান্ট রোডে। উনার একটি অফিস ছিল ঐ বিল্ডিংএর উপরতলায়। সেখানেই একটা রুম খালি করে মেশিনগুলো এনে রাখা হলো। এখানে উল্লেখ্য এই মেশিন কেনার অর্থায়ন হয়েছিল নান্নু ভাইদের পরিবার থেকে ঋণ করে। যা হোক সেই মেশিনও পড়ে থাকল। আর কোন মেশিনও কিনতে পারিনা। ব্যাংক লোন ও হয় না।

ব্যাবিলন গ্রুপের পরিচালক নিসার আহমেদ তখন (Astras Garments)-এর ফ্যাক্টরি ম্যানেজার। চট্টগ্রামের 'দেশ গার্মেন্টস' থেকে তিনি আমার সহকর্মী ও বন্ধু। আমার সাথে মুর্শেদ ভাইয়ের পরিচয়, পরে ব্যবসার প্রস্তাব, সুন্দর কনসোর্টিয়াম গঠনের আইডিয়া-এগুলো সবই উনি জানতেন। এও জানতেন আমরা উদ্যোগের শুরু থেকেই খোঁড়াচ্ছি। এখানে বলা দরকার নিসার সাহেব Astras-এ চাকুরিরত অবস্থায় অন্য উদ্যোক্তাদের সাথে একটি দু-লাইনের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে অংশীদার হন। ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ নামে ফ্যাক্টরিটি গ্রীণরোডস্থ একটি চারতলা বসতবাড়ীতে ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাবিলন গার্মেন্টস তখনো কোন সরাসরি অর্ডার পায়নি। সম্পূর্ণ সাব-কন্ট্রাক্ট নির্ভর ছিল ফ্যাক্টরিটি। ঐ সময়ে নিয়মিত সাব-কন্ট্রাক্ট পাওয়াও খুব কঠিন ছিল। কাজেই ব্যাবিলন প্রায়ই কর্মহীন থাকত।

আমরা যখন কনসোর্টিয়াম নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি তখন ব্যাবিলনের মালিকরা ভাবছেন ফ্যাক্টরিটি বিক্রি করে দিতে পারলে বাঁচা যেতো। নিসার সাহেবের কাছ থেকে এই রকম একটা আভাস পেয়ে আমরা সুন্দর কনসোর্টিয়ামের সবাই উৎসাহী হয়ে পড়ি। প্রস্তাব চলে যায় ব্যাবিলন মালিকদের কাছে। এই সময় সংগত কারনেই আমাদের মনে হয় ব্যাবিলনের সাথে নিসার সাহেব চলে এলে আমাদের দারুন লাভ হয়। Astras Garments এর ব্যবস্থাপনা ছাড়াও ওনার রয়েছে দেশ গার্মেন্টস-এ মেনটেন্যান্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কাজ করার অভিজ্ঞতা।

আকর্ষণীয় মূল্যে ও সহজ শর্তে তা পরিশোধের আশ্বাস সহ ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ আমাদের হলো। ১৯৮৫ সনের শেষ দিকের কথা এটা। গ্রীন রোডের চারতলা বাড়ীর পরিসরে রেখে ব্যাবিলনকে স্বাচ্ছন্দে চালানো যাবে না। এটা আমরা ভেবেছিলাম। কাজেই নতুন জায়গা খোঁজার পালা। মিরপুরের ৬নং সেকশনের দীর্ঘকাল বসবাসকারী আমার এক আত্মীয়ের (পরাগ ভাই) সহায়তায় খুঁজে পেলাম তখনকার হিসেবে

আমাদের জন্য খুবই উপযোগী একটা ফ্যাক্টরী ফ্লোর। পূরবী সিনেমার পার্শ্ববর্তী পূরবী মার্কেটের চারতলায় ব্যাবিলন গার্মেন্টস এর পূণর্জন্ম হলো। মনে আছে ১৯৮৬ সালের এপ্রিল নাগাদ আমরা সেখানে ফ্যাক্টরি সাজিয়ে ফেলেছি।

এখানে আবার একটু পিছনে ফিরে যেতে হয়। আমি যখন শান্তিনগরে কনজুমার প্রোডাক্টস লিঃ এ প্রডাকশন ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত তখন কাজের মাধ্যমে পরিচিত হই কিছু বায়িং হাউস ও ক্রেতার সাথে। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল তাইওয়ান ভিত্তিক Kex International ও আমেরিকান বায়িং হাউস Melcher & Landau । Kex International এর কর্ণধার ছিলেন Mr. Gary Kao; আর এর ঢাকাস্থ প্রধান ছিলেন মিঃ জাফর ওসমান (বর্তমানে ITC বা International Trade Connection এর জাফর ওসমান একই ব্যক্তি)। Key International এর Gary Kao, মিঃ জাফর ওসমান এবং Melcher & Landau এর শ্রীলংকান বড় কর্তা মিঃ সুরেন সিনাদুরে (Suren Sinnaduray) এর কাছে আমার তথা ব্যাবিলনের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। অবিশ্বাস্য সহযোগিতা আমরা পেয়েছি এদের কাছ থেকে আমাদের ভীষণ দুঃসময়ে। Gary এবং Suren আমাদেরকে বড় অংকের অর্ডার নিশ্চিত করেছেন ফ্যাক্টরি দর্শন না করেই। আমার ধারণা এ রকম বদান্যতা নজীর বিহীন।

আজকেও ভাবলে মজা পাই-আবেগ তাড়িত হয়ে সেই সময় আমরা Kex International এর ওসমান ভাইকে আমাদের কোম্পানির অংশীদার বানিয়ে ফেলি মুখে মুখে। সদা বিনয়ী এবং ভীষণ ভদ্র এই ভাল মানুষটি অবশ্য কখনো সেই শেয়ার দাবী করেননি-কিন্তু করার অধিকার ওনার ছিল।

আজকে অনেকেরই হয়তো জানা নেই ওভেন (Woven) শার্ট মেকার হিসেবে খ্যাত ব্যাবিলনের যাত্রা শুরু হয় Knit Garment তৈরী দিয়ে। Kex International এর প্রথম অর্ডারটি ছিল বেশ বড়। Jogging Set ও ভিন্ন ভিন্ন Top ও Bottom মিলিয়ে পাঁচটি Style Knit কাপড়ে। কাপড় ও আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি এসেছিল তাইওয়ান থেকে।

আমরা প্রায় বছর খানেক Knit Order করেছি। ক্রেতা Kex International, Melcher & Landau, Parthenon প্রমুখ। আমাদের Knit Garment এর ব্যবসা খুব সুখকর হয়নি। ঐ দিন গুলোতে ফ্যাক্টরির জন্য অভিজ্ঞ মেশিন অপারেটর বা সুপার ভাইজার বলতে গেলে পাওয়াই যেতোনা। প্রডাকশন ম্যানেজার নিয়োগের চিন্তাও করিনি- কারন তা ছিল সামর্থের বাইরে। ফ্যাক্টরিতে প্রডাকশন ম্যানেজার, কোয়ালিটি ম্যানেজার, মেশিনের সাধারন রোগ সারানোর মেকানিক বলতে আমিই ছিলাম। নিসার সাহেব ব্যাংক-কাস্টমস-এর কাজ সেরে সন্ধ্যার দিকে ধূলো-মলিন চেহারা নিয়ে ফ্যাক্টরিতে আসতেন মেশিনের জটিল রোগ গুলো সারতে। উনি ছিলেন ব্যাবিলন গার্মেন্টস এর স্বীকৃত প্রথম মেকানিক।

এবার একটা মজার কথা জানাই আপনাদেরকে। ১৯৮৭ সালের কোন এক সময়। তখন আমরা Knit Garment তেমন একটা করিনা। Kex International এর Gary Kao এসছেন একদিন ব্যাবিলন ফ্যাক্টরি পরিদর্শনে। ফ্লোরে হাটতে হাটতে একসময় তাঁকে জিজ্ঞেস করি আমাদের প্রথম অর্ডারটি কেমন বিক্রি হয়েছে। উনি একটু মুচকি হেসে বললেন ঐ শিপমেন্টের বেশির ভাগ মালতো এখনো গোডাউনেই পড়ে আছে।

খুব বাজে প্রডাক্ট পাঠিয়েছিলে এমদাদ! বুঝুন এবার। ব্যাবিলনের উষা লগ্নে এমন মহানুভব বায়ারদেরকে না পেলে আজকে আমরা হয়তো আকাশে সপ্তর্ষিতারা হয়ে ঝুলে থাকতাম। সেই দিনগুলোতে বায়ারদের অসাধারন সাপোর্ট আমরা আরো পেয়েছি। পরে বলছি সে কথা।

ব্যাবিলনের মতই হাত বদল হয়ে সুরভী গার্মেন্টস লিঃ আমাদের হয়ে যায় ১৯৮৭ সনে। নিউ এলিফ্যান্ট রোডে মূল মালিকরা ফ্যাক্টরিটিকে চালিয়ে ছিলেন কিছুকাল। ভাল চলেনি তাই সুরভীকেও নতুন ঠিকানা খুঁজে নিতে হয়েছে। সুরভী গার্মেন্টস এর মেশিনগুলো ছিল বেশ পুরনো ও সস্তা ব্রান্ডের। কাজেই সুলভেই ফ্যাক্টরিটি কিনতে পারি আমরা। এদেরও ছিল প্রায় দু'লাইনের মেশিন। প্রজেক্টটি ছিল Knit এর কাজেই ওভারলক মেশিন ছিল বেশ কটা। যাহোক ব্যাবিলন-সুরভী ভাই-বোন হয়ে একই ছাদের নিচে চার লাইনের ফ্যাক্টরি হয়ে চলতে লাগল মিরপুরে।

প্রায় একবছর Knit এর কাজ করে Woven এ উত্তরন- মনে আছেতো? তা সেই ক্রান্তিকালটা মনে আছে বেশ। বলিনি বোধ হয় আমাদের ঠিক নিচের ফ্লোরে ছিল ডেকো গার্মেন্টস লিঃ। শার্ট ফ্যাক্টরি ডেকোর যাত্রা শুরু ১৯৮৪ সন থেকে। ডেকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব শাহাদাত হোসেন কিরন আবার আমাদের তৎকালিন ম্যানেজিং ডিরেক্টর গোলাম মুর্শেদ ভাইয়ের বোনের হাজব্যান্ড। এই আত্মীয়তার সুবাদে ডেকোর সাথে শুরু থেকে আমাদের বিশেষ ঘনিষ্টতা। কিরন ভাইয়ের ছোট ভাই শহিদ হোসেন বা শহিদ ভাইয়ের সাথে পরিচয় ফ্যাক্টরি চালু করার সাথে সাথে হয়নি। ঐ সময়টিতে শহিদভাই বিদেশ সফরে ছিলেন।

প্রথম পরিচয়েই ভীষণ বন্ধুবৎসল ও দারুন সদালাপী শহিদ ভাই আমাকে আপন করে নিলেন। বললেন-কোন চিন্তা নেই। শার্ট করবেন? আমি দিচ্ছি কাজ। তা-এমনতো অনেকেই বলেন কিন্তু পরে তা ভুলে যান। কিন্তু শহিদ ভাই ভোলেননি।

ব্যাবিলন গার্মেন্টস এর প্রথম শার্ট-এর কাজ আসে ডেকোর ফ্লোর থেকে-Sub Contract। কোরিয়ান বায়িং কোম্পানি KI-ON TRADING -এর একটা পলি-কটন ৮০/২০ Dobby Stripe কাপড়ের শার্ট। আজো মনে আছে পরিষ্কার-যাতে আমাদের লাইন বসে না থাকে সেই জন্যে শহিদ ভাই প্রায় ৮০০ পিস এর মত শার্টের কাটা মাল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেলাই করার জন্য। আমরা সবাই দারুন খুশী-রীতিমত উত্তেজিত। আমার উত্তেজনাটাই বেশী। অনেকদিন পরে শার্ট পেয়েছি-যেটা আমি তুলনামূলক ভাবে ভাল বুঝি। ৮০০ পিস শার্ট প্রায় দশ দিন ধরে বানালাম। বা বলা উচিৎ বানাবার চেষ্টা করলাম। কাপড়ে শেড্ ছিল বেশ। সেলাইয়ের সময় পদে পদে সাবধানতার দরকার ছিল। আমি আজো জানিনা ঐ ৮০০ পিস শার্টের অর্ধেকটাও শহিদ ভাই Ship করতে পেরেছিলেন কিনা। কিন্তু আমাদেরকে পয়সা দিয়েছিলেন পুরোটাই।

ডেকো তথা শহিদ ভাইয়ের কাছে ব্যাবিলনের ঋণ অপরিমেয়। শহিদ ভাইয়ের জোড়ালো সুপারিশের কারনে অল্পকাল পরেই KI-ON TRADING -এর কাছ থেকে সরাসরি অর্ডার পেয়ে যাই আমরা। শার্টের অর্ডার ইউরোপের জন্য। এছাড়া ডেকোর মাধ্যমে ফরাসী ক্রেতা Longel-এর অনেক শার্টের অর্ডার পায় ব্যাবিলন।

১৯৮৭ সালের একসময় জনাব আবিদুর রহমান অর্থাৎ আমাদের আবিদ ভাই ব্যাবিলন পরিবার ভুক্ত হন।

দীর্ঘকাল আমেরিকায় প্রবাসী থাকার পর বাবার মৃত্যু উপলক্ষ্যে দেশে ফিরে আসেন। এরপর আর ফিরে যাওয়া হয়নি বিদেশে। ব্যাবিলন তখন নিদারুন অর্থকষ্টে। ঐ সময়ে আবিদ ভাইয়ের অন্তর্ভূক্তি ব্যাবিলনের যাত্রাপথকে অনেকটাই মসৃণ করেছে।

১৯৮৮ সনে KI-ON TRADING থেকে বেরিয়ে এসে Mr. Koo, Young International নামে একটি নতুন বায়িং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। Young International এ এসে যোগ দেন KI-ON TRADING-এর Mr. H.Y. Lee ও Mr. Aan। Young International এর প্রথম অর্ডারটিই পায় ব্যাবিলন। Buyer ছিল ফ্রান্সের Somotex। এখানে উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে যে ব্যাবিলনের সাফল্য ও বিস্তৃতির জন্য যে সব বায়িং প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিশেষের কাছে আমরা চির ঋণী তাদের অন্যতম হচ্ছে M/S.Young International এবং Mr. Koo ও Mr. H.Y. Lee (যাকে আমরা বড় ভাই বলে ডাকি)।

শুরু থেকে প্রায় ১৯৮৯ সন পর্যন্ত চারটি বছর ছিল অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের বছর ব্যাবিলনের জন্য। ১৯৮৮ সালে ছিল দেশজুড়ে ভয়াবহ বন্যা ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের বছর। এই কঠিন সময়গুলো পার করতে ও টিকে থাকার লড়াইয়ে নুয়ে না পরতে যাদের ত্যাগ ব্যাবিলন আজীবন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে তারা হলেন- মোঃ আমজাদ হোসেন বুলবুল, আলী আজগর, সোলাইমান আলী, লিয়াকত আলি খান, এস,কে,জামান, আবদুল হাই, জনাব শামছুদ্দোহা, মতিউর রহমান, কেরামত আলী প্রমুখ। এর বাইরে স্থানীয় সমস্যা নিরসনে পরাগ ভাই ও চলন্তিকা ক্লাবের সহযোগিতা অবশ্য স্মরণীয়।

পূরবী সিনেমা হল ও পূরবী মার্কেটের মালিক মুশফিকুর রহমান ভাইয়ের কথা এখানে আবশ্যক ভাবেই উল্লেখ করতে হয়। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা ও সাহায্য না পেলে ব্যাবিলনের চলার পথ আরো অনেক দুর্গম হতো।

আমাদের সবার অতি প্রিয় সালাম স্যার (আব্দুস সালাম শিকদার) ব্যাবিলনের সদস্য হলেন ১৯৯১ সালে। এর আগে প্রায় চার বছর কাজ করে এসেছেন ছবির মত দেশ সুইজারল্যান্ডে। সালাম সাহেবের অন্তর্ভূক্তির ফলে জন্ম নিল নতুন আরেকটি শার্ট ফ্যাক্টরি ল্যাপিন ড্রেসেস-এর (Lapin Dresses নামটি এখন আর আমাদের নেই)। প্রথমে দুই ও পরে আরো এক লাইন যোগ হয়ে ল্যাপিন ড্রেসেস লিঃ যিতু হ'ল পূরবী সিনেমার পেছনের বর্ধিতাংশে।

১৯৯০ সালে এসে আমরা বুঝেছি টিকে থাকার লড়াইয়ে আমরা বিজয়ী হয়েছি। এবারে শুধু এগিয়ে যাওয়ার পালা। ভাল শার্ট প্রস্তুতকারী হিসেবে অল্প-বিস্তর নাম হয়েছে তখন আমাদের। যুক্তরাজ্যের আমদানিকারক David Howard Company আমাদেরকে খুঁজে পায় ১৯৯১ সনে। বাংলাদেশে তাদের উপস্থিতি আরো কিছুকাল আগে থেকে। ব্যবসা বেড়ে যাওয়ায় ভাল ও নির্ভরযোগ্য আরেকটি ফ্যাক্টরী খুঁজছিল তারা। Victor Rawlinson (D.H. এর Managing Director) -এর কাছ থেকে অনুরোধ পান SGS-এর মোমিন ভাই ফ্যাক্টরি খুঁজে দেবার। মোমিন ভাইয়ের সুপারিশে Victor Rawlinson একদিন আসেন ব্যাবিলন দর্শনে। ফলশ্রুতিতে তাৎক্ষনিকভাবে ব্যাবিলন পায় ১৫০০০ পিসের এক ফর্মাল শার্টের অর্ডার। এই ট্রায়াল অর্ডার শিপ না হতেই ব্যাবিলন পেয়ে যায় চলমান শার্টের অর্ডার সামনের মাসগুলোর জন্য।

David Howard এর মাধ্যমে দীর্ঘকালের জন্য ব্যাবিলনের শার্ট কাস্টমার তালিকায় যোগ হয়-Burton, Debenham, Tesco, River Island, BHS এর মত নামী দামী ব্রান্ডের।

অল্প সময়ের ভেতরে কোয়ালিটি ও কমিটমেন্টের দিক থেকে ব্যাবিলনকে মাঝারি কাতার থেকে উপরের সারিতে ঠেলে তোলার ব্যাপারে David Howard কোম্পানির ভূমিকা ছিল সুবিশাল।

সূচনা লগ্নে ব্যাবিলনের টিকে থাকা ও তৎপরবর্তিকালে ব্যবসা প্রসারের ব্যাপারে অনুরুপ ভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা, ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য ও অন্যান্য শুভাকাঙ্খীদের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংক, বাংলাদেশ স্থানীয় শাখা (যেখানে ব্যাবিলন দায়বদ্ধ)-এর অসামান্য সহযোগিতা ও আশ্রয় প্রশ্রয়-এর গুরুত্ব ভাষায় প্রকাশ যোগ্য নয়।

সময়ের পথ বেয়ে ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ যেমন একক ফ্যাক্টরি অবস্থান থেকে গ্রুপ অব ফ্যাক্টরিজের মর্যাদায় আসীন হয়েছে তেমনি এসেছে এর পরিচালনা পর্ষদের ভেতরে পরিবর্তন। সুরজী গার্মেন্টস-এর পুরনো পরিচালকরা তাঁদের শেয়ার ছেড়েছেন-চলে গেছেন মোহাম্মদ ওসমান ব্যাবিলন ছেড়ে। তবে সবচে বড় ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনটি হয়েছে ১৯৯৬ সনে। ব্যাবিলন গার্মেন্টস-এর প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জনাব গোলাম মুর্শেদ নিজেকে অবমুক্ত করেন ব্যাবিলন থেকে এই সালে। এর আগে আমাদের সবার প্রাণপ্রিয় পরিচালক ফরহাদ ভাই দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেন ১৯৯৪ সালের ২রা মে লন্ডণে। ব্যাবিলনের পত্তন ও প্রসারে ফরহাদ ভাইয়ের অত্যন্ত দৃঢ় ও সফল ভূমিকা আমরা কখনো ভুলতে পারবোনা।

১৯৯৬ সালের ঐ বিশাল ওলট-পালটের পরে ব্যাবিলনের যেন নব জন্মই হলো। পরিবর্তিত পরিস্থিতির কিছু ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা মাথায় করে আমরা পাঁচজন নতুন সংকল্প নিয়ে আরেকবার ঝাঁপিয়ে পড়লাম সমরে। এর পরের ইতিহাস সাম্প্রতিক এবং মোটামুটি সবারই জানা। ব্যাবিলনের নিজস্ব ভবন তৈরী, অবনী টেক্সটাইল ও অবনী নিটওয়্যার প্রতিষ্ঠা, প্রিন্টিং, প্যাকেজিং ও গার্মেন্টস ওয়াশিং ফ্যাক্টরির আত্মপ্রকাশ এগুলো খুব বেশী দিনের কথা নয়।

বর্তমানে প্রায় ৭০০০ শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তা সমৃদ্ধ ব্যাবিলন গ্রুপের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে-ব্যাবিলন গ্রুপ দেশের রেডিমেড গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল সেক্টরের জন্য একটা অনুসরণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

# ফটো অ্যালবাম

ব্যাবিলন কথকতার ১৭ তম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচনী উৎসবের বিশেষ ক্ষণে আমন্ত্রিত অতিথিগণ, পত্রিকার কলাকুশলী ও লেখকগণ, প্রধান অতিথি, বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক, জনাব লুভা নাহিদ চৌধুরী।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ এর স্লোগান ঃ সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ - টি নিয়ে প্লাস্টিক ব্যাবহার নিয়ন্ত্রণে অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যাবিলন গ্রুপের র‍্যালি।

বার্ষিক ব্যাবসায়িক পরিকল্পনা-২০২৩ এবং দলগত দক্ষতা বৃদ্ধির অধিবেশনে ব্যাবিলনের নেতৃত্ব প্রদানকারী দলের একই ফ্রেমে বন্দি হবার বিশেষ মুহূর্ত (ডিসেম্বর, ২০২২)।

ব্যাবিলন গ্রুপে কর্মরত কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষার অগ্রগতিতে বরাবরই ভূমিকা রেখে আসছে ব্যাবিলন; এবারের আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের একাংশকে ফ্রেমে দেখা যাচ্ছে (মার্চ, ২০২৩)।

‘ঈদ আনন্দ হোক সকলের’ তারই প্রতিশ্রুতিতে ব্যাবিলন গ্রুপের শিশু দিবা পরিচর্যাকেন্দ্রের শিশুদের মাঝে ঈদের নতুন পোশাক বিতরণ করা হয় (রোজার ঈদ, ২০২৩)।

শীতার্ত মানুষের সহায়তায় সব সময় পাশে থাকে ব্যাবিলন। তারই ধারাবাহিকতায় ময়মনসিংহের শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ কার্য চলছে (ডিসেম্বর, ২০২২)।

BABYLON RESOURCES

NEWGEN

## B2B

- HR and Payroll Management System
- Sales & Care
- Production Management System
- Inventory Management System
- Babylon Payment Automation System (BPAS)
- LC Management System (LCM)
- Cash Incentive Management System

Skill Shoper

## Soft Skills Training

1. Soft Skills for 21st Century- Industry 4.0 & Future of Work
2. Personal Development Planning
3. Effective Communications Skills
4. Effective Presentation Skills
5. Time Management
6. Team Building, Collaboration & Team Work
7. Professional Manners & Etiquette at Workplace
8. Negotiation Skills
9. Leadership Skills
10. Effective personal branding

## B2G

- Software Development
- Apps & Games Development
- Human Resource Development

## Training

- Database
- Security
- Programming
- Networking
- Digital Marketing
- Graphics Design

## SaaS

- Eventay
- foodi

Floor–7A, House 3/1, Block F, Lalmatia, Mohammadpur, Dhaka 1207
+88 (02) 9015165, 9015348, +8809609003306 www.brlbd.com www.newgen-bd.com

# BABYLON TRIMS LIMITED

(A Concern of Babylon Group)

## Our Products:

- Auto Carton Box
- Manual Carton Box
- Top Divider
- Honeycomb
- Poly Bag (Side & Bottom Sealing)
- Recycle Poly Bag
- Zip Lock Poly Bag
- Roll Poly
- Gum Tape
- Back Board
- Neck Board
- Plastic Clip
- Collar Insert
- Butterfly
- Tie Band
- Photo Inlay
- Hang Tag
- Price Ticket
- Photo Box
- E-Flute Box
- Cascade
- Wrap Band
- Barcode Sticker
- Carton Sticker
- Size Sticker
- Tissue Paper
- Printed Label

**Compliance & Other Certifications**

- Gold certified of compliance by WRAP
- Amfori BSCI
- OEKO-TEX certified
- FEM certified
- FSC certified
- GRS certified
- RCS certified
- Sedex certified
- SLCP certified
- 90 Day's monitoring reports of Alliance
- PEFC (We are the first certified facility in BD)

**Office & Factory :**
Kandi Boilarpur, Horindhara
Hemayetpur, Savar
Dhaka-1340, Bangladesh.
Cell: +8801886-230366
E-mail: arifrazzaque@babylon-bd.com

**Marketing Office :**
House-28 (1st Floor)
Road-6/B, Sector-12, Uttara
Dhaka, Bangladesh.
Cell: +8801714-206566
E-mail: shakilbtl@babylon-bd.com

**Corporate Office :**
2-B/1, Darussalam Road, Mirpur
Dhaka-1216, Bangladesh.
Tel: 9023495-6, 9025495, 9023460,
9023462-63, 9007175,9010533, 8011089
Fax: 880-2-8015128

**Web: www.babylongroup.com**

**Corporate Office:**
2-B/1, Darussalam Road, Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh.
Tel : +8809609003300
E-mail: babylon@babylon-bd.com
Web : www.babylongroup.com
www.babylonkathokata.com